খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের
চারিটি প্রশ্নের উত্তর

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর

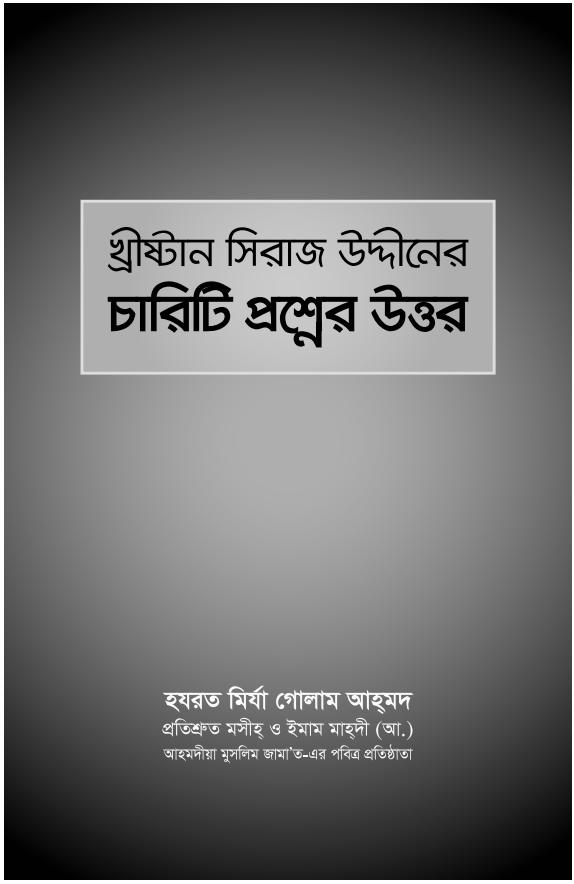

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর

গ্রন্থস্বত্ত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ. কে.

প্রকাশনায় | আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

ভাষান্তর | মরহুম মৌলবী মুহিবুল্লাহ্ ও
মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ আলী আনোয়ার

প্রকাশকাল | ১ম বাংলা প্রকাশ: ১৯৬৩
৪র্থ বাংলা সংস্করণ: জুন ২০২২

সংখ্যা | ২০০০ কপি

মুদ্রণে | বাড-ঔ-লিভস্
বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লি. ভবন,
৮৯-৮৯/১ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

Four Questions by Mr. Sirajuddin, a Christian, And their Answers

খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর

by **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani**
The Promised Messiah and Imam Mahdi[as]

Translated into Bengali by
Late Maulvi Muhibullah &
Late Maulvi Mohammad Ali Anwar

1st Bangla translation Published in Bangladesh in 1963
4th reprint in Bangladesh in June 2022

Published by
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© **Islam International Publications Ltd., UK**

ISBN 978-984-991-053-4

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এই পুস্তকটি উর্দুতে ২২ জুন ১৮৯৭ সালে প্রকাশ করেন। সিরাজ উদ্দীন নামক একজন খ্রিস্টান ব্যক্তি যে লাহোরের এফ.সি কলেজের প্রফেসর ছিল। প্রথমে মুসলমান ছিল কিন্তু পাদ্রীদের সাথে ওঠাবসা এবং তাদের যুক্তির ফাঁদে পড়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়। অতঃপর ১৮৯৭ সালে সে যখন কাদিয়ানে যায় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সংসর্গে কিছুদিন থাকে আর খ্রিস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করে তখন সে পুনরায় ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারে। সে আবার নামায পড়া আরম্ভ করে কিন্তু যখন লাহোরে ফিরে আসে তখন পুনরায় খ্রিস্টানদের জালে ফেঁসে যায়। আবার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে চারটি প্রশ্ন লিখে পাঠায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেগুলোর উত্তর প্রস্তুত করেন এবং **"খ্রিস্টান সিরাজ উদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর"** শিরোনামে ২২ জুন ১৮৯৭ তারিখে তা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা সমীচীন, ১৮৯৭ সাল বিশ্বের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই সালে সারাবিশ্বে খ্রিস্টান ধর্মের জয়জয়কার ছিল। আমেরিকার একজন প্রখ্যাত ডাক্তার জন হেনরী বিরুয ১৮৯৬-৯৭ সাল জুড়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে খ্রিস্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। তার এই বক্তৃতামালা ১৮৯৭ সালেই ভারতের খ্রিস্টান লিটারেচার সোসাইটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে। এই পুস্তকের পরতে পরতে রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশংসা এবং খ্রিস্টান ধর্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা লিখিত আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসব কথার দাঁতভাঙা জবাব দেন উক্ত পুস্তকে। তিনি (আ.) বলেন–

"খ্রিস্টানরা যে প্রশান্তি লাভ করেছে তা কেবল উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্মীয় নব বিধান উদ্ভাবনের ফল। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রশান্তি যা খোদার সান্নিধ্য লাভের ফলে পাওয়া যায় সেসম্পর্কে আমি শপথ করে বলছি যে, এই খ্রিস্টান জাতি তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তাদের চোখের উপর পর্দা, তাদের হৃদয় মৃত এবং তারা অন্ধকারে নিপতিত। তারা প্রকৃত খোদা সম্বন্ধে একেবারেই অনবহিত অথচ

একজন দুর্বল মানুষ যে অনাদি সত্তার সামনে কিছুই নয় তাকে তারা অযথা খোদা বানিয়ে রেখেছে। তাদের মধ্যে আশিস নেই। তাদের মধ্যে চিত্তজ্যোতিঃ নেই। প্রকৃত খোদাপ্রেম তাদের মাঝে বিদ্যমান নেই। বরং সেই প্রকৃত খোদার পরিচয়ই তারা জানে না। তাদের মধ্যে কেউ নেই এমনকি একজনও নেই যার মাঝে ঈমানের লক্ষণ বিদ্যমান। ঈমান সত্যিই যদি কোন নিয়ামত হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই এর লক্ষণও থাকবে। কিন্তু কোথায় আছে এমন খ্রিস্টান যার মধ্যে যিশু বর্ণিত লক্ষণাবলী দেখতে পাওয়া যায়? অতএব হয় ইঞ্জিল মিথ্যা, নয় খ্রিস্টানরা মিথ্যাবাদী।

দেখুন! কুরআন শরীফে ঈমানদারের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে সে লক্ষণযুক্ত মানুষ ইসলামের মধ্যে প্রতি যুগেই পাওয়া গিয়েছে। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, ঈমানদাররা এলহাম পেয়ে থাকে। ঈমানদার খোদার বাণী শোনে। ঈমানদারের দোয়া অধিক কবুল হয়। ঈমানদারের নিকট গায়েবের খবর প্রকাশ করা হয়। ঈমানদারের সাথে ঐশী সাহায্য থাকে। পূর্ববর্তী যুগেও যেমন এসব লক্ষণ পাওয়া যেত তেমনই এখনো পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআন শরীফ খোদার পবিত্র বাণী এবং কুরআনের প্রতিশ্রুতি খোদার প্রতিশ্রুতি। **অতএব হে খ্রিস্টানেরা, এসো! তোমাদের যদি শক্তি-সামর্থ্য থাকে তবে আমার সাথে মোকাবিলা করো। আমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকলে আমাকে অবশ্যই জবাই করে ফেল। অন্যথায় তোমরা খোদার অভিযোগের আওতাভুক্ত এবং জাহান্নামের আগুনের উপর তোমরা দাঁড়িয়ে আছো।"** [খ্রিস্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১২, পৃ: ৩৭৪]

বর্তমানে এটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। উক্ত পুস্তিকা প্রকাশে যারা যেভাবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের ইহকালে ও পরকালে পুরস্কৃত করুন। আমীন।

আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

১৫ জুন ২০২২

লেখক পরিচিতি

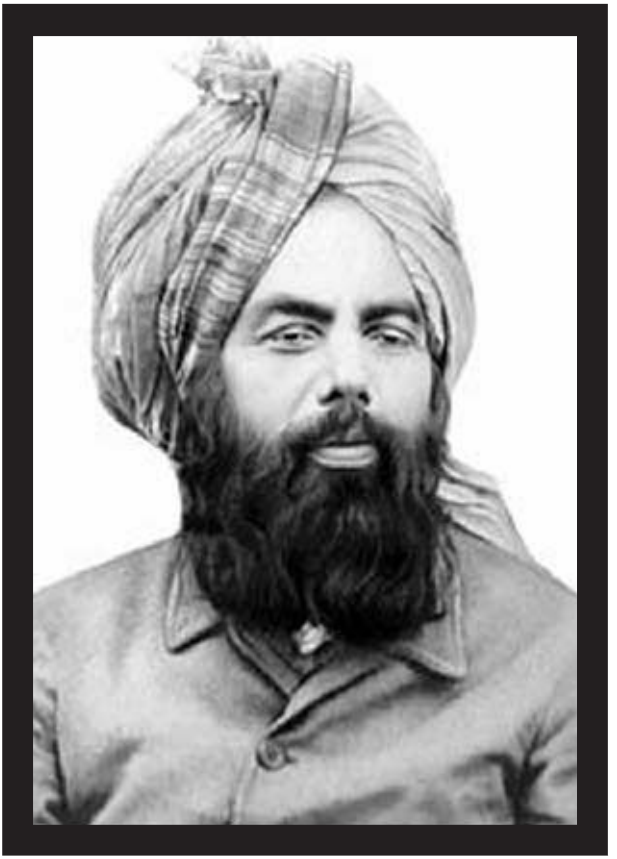

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৩৫ সনে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবনযাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ, আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্মবিশ্বাসে সন্দেহ,

সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বিশাল রচনাসমগ্র (প্রায় ৮৮টি পুস্তক), বক্তৃতা, আলোচনা, ধর্মীয় বিতর্ক (বাহাস) প্রভৃতিতে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকূল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মের বিধিবিধানই কেবল মানবজাতিকে নৈতিকতা, উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি এবং আধ্যাত্মিকতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে। তিনি ঘোষণা করেন– কুরআন, বাইবেল ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মসীহ্ ও মাহদী হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সন হতে তিনি তাঁর হাতে সকলকে একত্র হওয়ার জন্য বয়আত গ্রহণ করা শুরু করেন যা এখন বিশ্বের ২১৬টি দেশজুড়ে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। ১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুর পর হযরত মওলানা হেকীম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল-এর মৃত্যুর পর হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বড় পুত্র ও ইমাম মাহ্দীর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয়। এরপর তাঁর ছোট ভাই হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খলীফা নির্বাচিত হন। ১৯ এপ্রিল ২০০৩ সনে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) জামা'তকে বিশ্বময় ব্যাপক পরিচিতি ও বর্তমানের শক্তিশালী অবস্থায় আনার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিল বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা, আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রধান হিসেবে বর্তমানে নেতৃত্ব দান করে চলেছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক আশিস লাভকারী এক সৌভাগ্যবান প্রপৌত্র।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

খ্রীষ্টান সিরাজ উদ্দীনের
চারিটি প্রশ্নের উত্তর

সিরাজ উদ্দীন নামক একজন খ্রীষ্টান লাহোর হইতে আমার নিকট চারিটি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। জনসাধারণের উপকারার্থে উহার উত্তর লিখিয়া প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি। তাই, চারিটি প্রশ্নই উত্তর সহ নিম্নে লিখিয়া প্রকাশ করা গেল।

প্রথম প্রশ্নঃ

খ্রীষ্টানদের মতে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমন হইয়াছিল মানব জাতিকে প্রেম করিতে এবং স্বীয় জীবন তাহাদিগের জন্য উৎসর্গ করিতে। ইসলাম-ধর্ম-প্রবর্তকের আগমনের উদ্দেশ্যের মধ্যে কি এই দুইটি বিষয়ের প্রকাশ আছে? অথবা প্রেম এবং কোরবানীর (আত্ম-উৎসর্গের) পরিবর্তে অপর কোন উত্তম শব্দের দ্বারা কি সেই উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করিতে পারেন?

উত্তরঃ

উপরোক্ত প্রশ্নের দ্বারা প্রশ্নকারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই মনে হইতেছে যে, খ্রীষ্টানদের মতে যীশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে এই জন্য আগমন করিয়াছিলেন যেন তিনি পাপীদের সহিত প্রেম করিয়া তাহাদের পাপসমূহের অভিশাপ স্বীয় মস্তকে বহন করেন এবং ঐ সকল পাপীকে পাপ-মুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেন। পাপীদের উদ্ধারের জন্য কি এইরূপ **অভিশপ্ত কোরবানীর** নমুনা কোরআন পেশ করিয়াছে? যদি ইহা না করিয়া থাকে, তাহা হইলে কোরআন মানবের মুক্তির জন্য কি ইহা অপেক্ষা কোন উত্তম পথ প্রদর্শন করিয়াছে?

ইহার উত্তরে মিয়াঁ সিরাজ উদ্দীন সাহেব মনে রাখিবেন যে, কোরআন পাপীদের মুক্তির জন্য এই ধরনের অভিশপ্ত কোরবানী পেশ করে না। বরং কোটি কোটি মানুষের পাপের অভিশাপ একত্র করিয়া এক জনের ঘাড়ে চাপান

দূরে থাকুক, এমন কি মাত্র এক ব্যক্তির পাপ বা অভিশাপ অপর এক ব্যক্তির ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া কোরআন আদৌ ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ মনে করে না।

কোরআনের স্পষ্ট উক্তি হইল:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى

'একের পাপ অপরে বহন করিবে না।' (সূরা আল্ আনআম: ১৬৫)

মুক্তির সমস্যা সম্বন্ধে কোরআনের শিক্ষা বর্ণনার পূর্বে খ্রীষ্টানদের নীতি বা মতবাদের ভ্রান্তি জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করি, যাহাতে এই সমস্যা সম্পর্কে যাঁহারা কোরআন ও ইঞ্জিলের মধ্যে তুলনা করিতে চাহেন, তাঁহারা যেন সহজে তা করিতে পারেন।

অতএব, স্মরণ রাখিবেন যে, খ্রীষ্টানদের মতে খোদা তা'লা পৃথিবীকে ভালবাসিয়া, উহার মুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, খোদাদ্রোহী, কাফের এবং পাপীদের পাপ স্বীয় প্রিয় পুত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন এবং পৃথিবীকে পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে লটকাইয়াছেন। এই মূল নীতি সকল দিক দিয়াই অলীক এবং লজ্জাকর। যদি ন্যায় নীতির তুলাদণ্ডে ওজন করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ইহা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপানোর মত গুরুতর অন্যায়। মানবের বিবেক ইহা কখনও পসন্দ করিবে না যে, একজন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার অপরাধের শাস্তি অন্য এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে দেওয়া হউক। যদি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে পাপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও ইহা অলীক সাব্যস্ত হইবে। কেননা প্রকৃত পক্ষে পাপ এমন এক বিষ, যাহা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন মানুষ খোদা তা'লার প্রতি আনুগত্য, তাঁহার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রেম এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ স্মরণ হইতে স্খলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়। মাটি হইতে কোন উৎপাটিত বৃক্ষ যেমন রস শোষণ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া দিন দিন শুকাইতে থাকে এবং অবশেষে উহার সরসতা ও সজীবতা বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ যাহার মন খোদা তা'লার প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহারও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। শুষ্কতার ন্যায় পাপ তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। এই পাপরূপী শুষ্কতার প্রতিকারের জন্য খোদা তা'লার বিধানে তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে: (১) প্রেম, (২) 'এস্তেগফার', যাহার অর্থ চাপিয়া এবং ঢাকিয়া দেওয়ার ইচ্ছা। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত বৃক্ষের শিকড় মাটিতে

প্রোথিত ও আবৃত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা সজীবতার আশা রাখে, (৩) তৃতীয় বিধান হইল তওবা বা অনুশোচনা। জীবনবারি আকর্ষণ করার জন্য খোদা তা'লার দিকে বিনম্রভাবে প্রত্যাবর্তন করা এবং নিজ সত্তাকে তাঁহার নিকটবর্তী করা এবং সময়োপযোগী সৎকর্ম দ্বারা পাপের আবেষ্টন হইতে নিজেকে বাহির করা। তওবা শুধু মৌখিক নহে, বরং তওবার পূর্ণতা সৎকর্মের সহিত সংযুক্ত। যাবতীয় সৎকর্মই তওবা পূর্ণতার জন্য। সকল সৎ কর্মের উদ্দেশ্যই খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। দোয়াও এক প্রকার তওবা। উহার দ্বারা আমরা খোদা তা'লার নৈকট্য অন্বেষণ করি। এই জন্য খোদা তা'লা প্রাণ সৃষ্টি করিয়া, উহার নাম রূহ রাখিয়াছেন, যেহেতু উহার প্রকৃত আনন্দ ও আরাম খোদা তা'লার স্বীকৃতিতে এবং তাঁহার প্রেম ও তাঁহার আদেশ পালনে নিহিত। আবার তিনি উহার নাম 'নফস'* রাখিয়াছেন, যেহেতু উহা খোদা তা'লার সহিত ঐক্য সৃষ্টি করে। খোদা তা'লার প্রতি প্রেমে মগ্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত বাগানের সেই বৃক্ষের ন্যায়, যাহার শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হইয়াছে। ইহাই মানুষের বেহেশ্‌ত। বৃক্ষ যেভাবে মাটির রস গ্রহণ করে এবং নিজের মধ্যে টানিয়া লয় এবং উহার সাহায্যে আপন বিষাক্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলে, মানব মনের অবস্থাও তদ্রূপ। সে খোদা তা'লার প্রেমের পানি গ্রহণ করিয়া, তাহার অন্তর হইতে বিষাক্ত পদার্থ বাহির করিয়া ফেলিতে সক্ষম হয় এবং অতি সহজে সেইসব বিষাক্ত বস্তু দূর করিয়া দিয়া খোদা তা'লার মধ্যে বিলীন হইয়া, সে পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। ফলে, তাহার আত্মা অত্যন্ত প্রশস্ত, সজীব ও ফলে ফুলে সুশোভিত হয়। কিন্তু খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি সেই পুষ্টিসাধনকারী পানি গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া সে প্রতি মুহূর্তে শুষ্ক হইতে থাকে। অবশেষে, পাতা ঝরিয়া শুষ্ক ও সৌন্দর্যবিহীন শাখার সমষ্টি মাত্র থাকিয়া যায়। সুতরাং যেহেতু পাপের শুষ্কতা সম্পর্কহীনতা হইতে উদ্ভূত হয়, এই জন্য এই শুষ্কতার একমাত্র চিকিৎসা হইল **খোদা তা'লার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা**। প্রাকৃতিক বিধান ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই দিকে ইশারা করিয়া আল্লাহ্ তা'লা বলিতেছেন–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

* অভিধানে 'নফস' বস্তুর সত্তাকে বুঝায়।

'হে খোদা তা'লা হইতে শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তোমার প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। এমতাবস্থায় যে তুমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। অতএব, তুমি আমার ভক্তগণের অন্তর্গত হও এবং আমার বেহেশ্‌তে প্রবেশ কর'। (সূরা আল্ ফজর: ২৮-৩১)

ফল কথা, পাপ বিদূরিত করিবার একমাত্র উপায় খোদা তা'লার সহিত প্রেম ও ভালবাসা। অতএব যেসকল সৎকর্ম প্রেম ও ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয় সেই সকল সৎকর্ম পাপের আগুনে পানি নিক্ষেপ করে। কেননা মানুষ খোদা তা'লার জন্য সৎকর্ম করিয়া তাহার প্রেমের প্রমাণ দেয়। খোদা তা'লাকে এরূপভাবে মান্য করা, যেন তাঁহাকে প্রত্যেক বস্তুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়; এমন কি, স্বীয় প্রাণের ওপরেও প্রাধান্য দেওয়া হয়– ইহাই প্রেমের প্রথম সোপান। ইহার দৃষ্টান্ত সেই বৃক্ষের ন্যায় যাহা মাটিতে রোপন করা হয়। ইহার পর, দ্বিতীয় সোপান 'এস্তেগফার', যাহার উদ্দেশ্য হইল খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন মানবসুলভ দুর্বলতা প্রকাশ না পায়। এই স্তর, বৃক্ষের সেই অবস্থার অনুরূপ, যখন উহা সুদৃঢ়ভাবে স্বীয় কাণ্ড মাটিতে প্রতিষ্ঠা করিয়া লয়। ইহার পর, তৃতীয় সোপান হইল তওবা, যাহার তুলনা বৃক্ষের সেই অবস্থার সহিত, যখন উহা স্বীয় কাণ্ড পানির নিকটবর্তী করিয়া শিশুর ন্যায় উহা চোষণ করিতে থাকে। বস্তুতঃ পাপের দার্শনিক তত্ত্ব ইহাই যে, খোদা তা'লার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উহার উৎপত্তি। অতএব, ইহা বিদূরিত করার উপায় খোদা তা'লার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের সহিত বিজড়িত। কত নির্বোধ তাহারা, যাহারা কোন ব্যক্তির আত্মহত্যাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মনে করে!

ইহা বড় হাস্যকর কথা যে, কোন ব্যক্তি অপরের মাথা ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য স্বীয় মাথায় পাথর মারে বা অপরকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করে। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে এমন কোন বুদ্ধিমান নাই, যে এই জাতীয় আত্মহত্যাকে মানবতার প্রতি সহানুভূতি বলিবে। মানবতার প্রতি সহানুভূতি অবশ্যই উত্তম গুণ এবং অপরের জন্য যাতনা সহ্য করা বড়ই বীরত্বের কাজ। কিন্তু সেই সকল যাতনার বোঝা বহন করার পন্থা কি ইহাই যাহা যীশুর সম্পর্কে বলা হয়? হায়! যদি যীশু আত্মহত্যা হতে বিরত থাকিতেন এবং অপরের শান্তির জন্য বুদ্ধিমানের ন্যায় কষ্ট ভোগ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা অবশ্যই পৃথিবী উপকৃত হইত। যথা– কোন গৃহহীন দরিদ্র ব্যক্তি যদি ঘরের কাজে মিস্ত্রী লাগাইতে সক্ষম না হয় এবং

এমতাবস্থায় যদি কোন মিস্ত্রী তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া কিছু দিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে তাহার ঘর তৈরী করিয়া দেয়, তাহা হইলে অবশ্য সেই মিস্ত্রী প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র। নিশ্চয়, সে এক দরিদ্রের গৃহ নির্মাণ করিয়া দিয়া তাহার প্রতি দয়া দেখাইয়াছে। কিন্তু সে যদি ঐ ব্যক্তির প্রতি দয়া দেখাইয়া, আপন মাথায় পাথর মারিত, তাহাতে সেই অসহায় ব্যক্তির কি লাভ হইত? পরিতাপ! পৃথিবীতে খুব অল্প লোকই আছে, যাহারা সৎকর্মের অনুশীলন ও দয়া প্রদর্শনে বুদ্ধিমানের পন্থা অবলম্বন করে। যীশু যদি সত্যই ইহা মনে করিয়া আত্মহত্যা করিয়া গিয়া থাকেন যে, তাহার ঈদৃশ মরণে মানব জাতি মুক্তি পাইবে, তাহা ইহলে তিনি করুণা ও কৃপার পাত্র। তাঁহার এই ঘটনা জগতের সম্মুখে পেশ করার যোগ্য নহে; পরন্তু উহা গোপন করার যোগ্য।

যীশু সম্পর্কে আরোপিত খ্রীষ্টানদের এই নীতিকে যদি আমরা অভিশাপের অর্থে যাচাই করি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, তাহারা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যীশুর প্রতি এরূপ বে-আদবী করিয়াছে, যাহা পৃথিবীর কোন জাতি তাহাদের নবী-রসূলের প্রতি করে নাই। কারণ তিন দিনের জন্য হইলেও, যীশুর অভিশপ্ত হওয়া, খ্রীষ্টানগণের ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ। যীশুকে অভিশপ্ত বলিয়া না মানিলে খ্রীষ্টিয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং কোরবানীর-ক্রুশবাদ বাতিল হইয়া যায়। অভিশাপই যেন এই সকল ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি ও কড়িকাঠ!

মানব জাতির প্রতি ভালবাসার জন্য পৃথিবীতে যীশুর প্রেরণ এবং মানব জাতির জন্যই তাঁহার প্রাণ দানের কথা খ্রীষ্টানদের ধারণা মতে তখনই ফলপ্রদ হয়, যখন বিশ্বাস রাখা যায় যে, যীশু পৃথিবীর আদি পাপের জন্য অভিশপ্ত হইয়াছেন এবং অভিশপ্ত কাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছেন। এই জন্যই আমরা পূর্বে ইঙ্গিত দিয়া আসিয়াছি যে, যীশু খ্রীষ্টের কোরবানী অভিশপ্ত কোরবানী। পাপ হইতে অভিশাপ আসিয়াছে এবং অভিশাপ হইতে তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছেন। এখন বিচার্য বিষয় হইল, অভিশাপের ছাপ কি কোন সত্যবাদীর ওপর আরোপ করা হইতে পারে? সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, খ্রীষ্টানগণ যীশুর প্রতি অভিশাপ আরোপ করিয়া বড়ই ভুল করিয়াছে, যদিও উহা মাত্র তিন দিনের জন্য, অথবা ইহা অপেক্ষা আরো অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন। কারণ, অভিশাপ এমন এক বিষয়, যাহা অভিশপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং কোন

ব্যক্তিকে তখনই অভিশপ্ত বলা যায়, যখন তাহার অন্তঃকরণ খোদা হইতে একেবারে বিমুখ হইয়া তাঁহার শত্রু হইয়া যায়। এই জন্যই শয়তানকে লায়ীন বা অভিশপ্ত বলা হয়। এই কথা কাহারও অজানা নাই যে, নৈকট্য হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াকে 'লানৎ' বলে। এই বাক্য সেই ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, যাহার অন্তঃকরণ খোদা তা'লার প্রেম এবং এতায়াত (আনুগত্য) হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে খোদা তা'লার শত্রু হইয়া গিয়াছে। 'লানৎ' শব্দের তাৎপর্য ইহাই। অভিধান প্রণেতাগণ সকলেই এই বিষয়ে একমত। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য, সত্যই যদি যীশুখ্রীষ্টের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে মানিতে হইবে যে, তিনি প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ্ তা'লার অভিশাপের পাত্র হইয়াছিলেন। খোদা তা'লার মারেফত, এতায়াত এবং মহব্বত তাঁহার অন্তর হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি খোদার শত্রু এবং খোদা তা'লাও তাঁহার শত্রু হইয়া গিয়াছিলেন। খোদা তা'লাও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিনিও খোদা তা'লার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ লানতের তাৎপর্য ইহাই। এইরূপ হইলে ইহাই বুঝায় যে, তিনি অভিশপ্ত দিনগুলিতে প্রকৃতই কাফের, খোদা তা'লা হইতে বিমুখ এবং খোদা তা'লার শত্রু হইয়াছিলেন এবং শয়তানের স্বভাব ধারণ করিয়াছিলেন। যীশুর সম্বন্ধে এই জাতীয় বিশ্বাস পোষণ, আর নাউযুবিল্লাহ্ তাঁহাকে শয়তানের ভাই বলা সমান। আমার বিশ্বাস, কোন সত্যবাদী নবী সম্পর্কে এই জাতীয় ধৃষ্টতা কোন খোদাভীরু মানুষ পোষণ করিতে পারে না। একমাত্র দুষ্ট ও অপবিত্র লোকের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

অতএব, যখন যীশুখ্রীষ্টের আত্মা অভিশপ্ত হওয়া মিথ্যা প্রতিপন্ন হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে মানিয়া লইতে হইবে যে, এই জাতীয় অভিশপ্ত কোরবানীও মিথ্যা। ইহা ভ্রান্ত ও অজ্ঞ লোকদের দ্বারা রচিত। যদি মুক্তি লাভের জন্য প্রথমে খ্রীষ্টকে শয়তান, খোদার শত্রু ও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহা হইলে এরূপ মুক্তির উপর অভিশাপ। ইহা অপেক্ষা দোযখ বরণ করিয়া লওয়া খ্রীষ্টানগণের জন্য উত্তম ছিল; কিন্তু তবুও আল্লাহ্র একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শয়তানের উপাধি দ্বারা কলুষিত করা উচিত হয় নাই। পরিতাপ! তাহারা কিরূপ অন্তঃসারশূন্য ও অপবিত্র কথার ওপর ভরসা করিয়া রহিয়াছে। এক দিক দিয়া তাহারা তাঁহাকে খোদার পুত্র, খোদা হইতে উদ্ভূত এবং খোদা তা'লার সহিত একীভূত বলিয়া মনে করে এবং অপর দিকে তাঁহারা তাঁহাকে

শয়তানের উপাধি দেয়, 'অভিশপ্ত' বলে। লানৎ বা অভিশাপ শয়তানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং লায়ীন, শয়তানের নাম। লানতী বা অভিশপ্ত ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শয়তান হইতে উদ্ভূত, শয়তানের সহিত মিলিত এবং নিজে শয়তান। সুতরাং খ্রীষ্টানদের মতে যীশুর মধ্যে দুই প্রকারের ত্রিত্ববাদ পাওয়া যায়– রহ্মানী ও শয়তানী। নাউযুবিল্লাহ্, যীশু শয়তানের অন্তর্গত হইয়া শয়তানের মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়াছিলেন এবং লানতের ফলে শয়তানীস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ খোদার অবাধ্য ও খোদার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি খোদার শত্রু হইয়াছিলেন।

মিয়াঁ সিরাজউদ্দীন! বিচারের সহিত বলুন। এই মিশন যাহা খ্রীষ্টের ওপর আরোপ করা হয়, উহার মধ্যে কি কোন আধ্যাত্মিক বা যৌক্তিক পবিত্রতা আছে? পৃথিবীতে কি ইহা অপেক্ষা জঘন্য আর কোন বিশ্বাস আছে, যাহাতে নিজের মুক্তির জন্য কোন খোদা প্রেমিককে খোদার শত্রু এবং খোদাদ্রোহী ও শয়তান সাব্যস্ত করা হয়? খোদা তা'লা, যিনি সর্বশক্তিমান, অনন্ত করুণাময় এবং দয়াময়, তাঁহার এই লানতী কোরবানীর কি আবশ্যক ছিল?

পুনরায় মতবাদকে যখন আর এক দিক দিয়া যাচাই করা যায় যে, ইহুদীগণকেও কি এরূপ লানতী কোরবানীর শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল, তখন এই মিথ্যার প্রকৃত স্বরূপ আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য খোদা তা'লার হাতে যদি এক মাত্র এই উপায়ই ছিল যে, তাঁহার এক পুত্র হইবেন এবং তিনি সমস্ত পাপীর পাপজনিত অভিশাপ আপন স্কন্ধে বহন করিয়া অভিশপ্ত কোরবানীস্বরূপ ক্রুশে আরোহণ করিবেন, তাহা হইলে তৌরাতে এবং ইহুদীদের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে এইরূপ অভিশপ্ত মৃত্যুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ থাকা আবশ্যক ছিল। কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষ ইহা বিশ্বাস করিতে পারে না যে, মানব জাতির মুক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'লা যে আদি ও চিরস্থায়ী নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা সব সময়েই পরিবর্তিত হইতে থাকিবে। ইহা কখনই হইতে পারে না যে, তৌরাতের যুগে তাহা এক প্রকার, আবার ইঞ্জিলের যুগে অন্য প্রকার এবং কোরআনের যুগে আর এক প্রকার ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশের নবীগণের যুগে অন্য প্রকারের ছিল। আমরা তৌরাত এবং ইহুদীদের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ভালভাবে গবেষণা করিলে দেখিতে পাই যে, উহাদের কোনটির মধ্যেই এই লানতী মৃত্যুর শিক্ষা নাই। আমরা ইদানিং বহু বড় বড় বিদ্বান ইহুদী পণ্ডিতের

নিকট পত্র যোগে খোদা তা'লার শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, মানব জাতির মুক্তির জন্য তৌরাত এবং অন্যান্য ধর্মপুস্তকে তাঁহাদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে? ঐ সব গ্রন্থে খোদার পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত ও তাঁহার কোরবানীর প্রতি ঈমান রাখার শিক্ষা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে কি? বা অন্য কোন শিক্ষা? উত্তরে তাঁহারা জানাইয়াছেন, "মুক্তি সম্পর্কে তৌরাতের শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কোরআনেরই অনুরূপ।" অর্থাৎ- খোদা তা'লার দিকে পূর্ণ প্রত্যাবর্তন, পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং প্রবৃত্তির তাড়না হইতে দূরে থাকিয়া খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পুণ্য কর্ম করা এবং তাঁহার নির্দিষ্ট সীমা, বিধান, আদেশ ও নির্দেশাবলী বিশেষ দৃঢ়তা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার সহিত পালন করা। ইহাই মুক্তির উপায়। তৌরাতে ইহাই পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। খোদা তা'লার পবিত্র নবীগণ মানব জাতিকে উহারই উপর আমল করাইয়া আসিয়াছেন এবং উহা পরিত্যাগ করার জন্য শাস্তিও অবতীর্ণ হইয়াছে। উক্ত পণ্ডিতগণ পত্রে শুধু বিস্তারিত উত্তর দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং তাঁহারা খ্যাতনামা বিশ্বস্ত পণ্ডিতগণের লিখিত মূল্যবান ও অভিনব পুস্তকাবলী আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। ঐ সকল পুস্তক ও পত্রাদি এখনও আমার নিকট আছে। কেহ দেখিতে চাহিলে আমি উহা তাহাদিগকে দেখাইতে পারি। ঐ সকল প্রমাণ একটি বিস্তারিত পুস্তকে আমি সংকলন করার ইচ্ছা রাখি।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত বিচার, বুদ্ধি ও পরিষ্কার মন নিয়া চিন্তা করা। যদি ইহা সত্য হইত যে, খোদা তা'লা যীশু খ্রীষ্টকে আপন পুত্র সাব্যস্ত করিয়া এবং অপরের অভিশাপ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া, এই অভিশপ্ত কোরবানীকে মানব জাতির মুক্তির কারণ করিয়াছেন এবং এই শিক্ষাই ইহুদীগণ পাইয়াছিল তাহা হইলে এই শিক্ষাকে ইহুদীগণের আজ পর্যন্ত গোপন রাখিবার এবং এই শিক্ষার বিরুদ্ধে তাহাদের চির শত্রুতার কারণ কি? এই আপত্তি আরও শক্তিশালী হয় যখন আমরা দেখি যে, ইহুদীগণের শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য পর পর নবীগণেরও আবির্ভাব হইয়াছিল এবং হযরত মূসা আলাইহেস সালামও কয়েক লক্ষ লোকের সামনে তৌরাতের শিক্ষা বর্ণনা করিয়াছিলেন। অতএব যে শিক্ষা ইহুদীগণ যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে পাইয়া আসিয়াছে, তাহাদের পক্ষে উহা ভুলিয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব? পরন্তু তাহাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যেন খোদা তা'লার আদেশ ও নির্দেশাবলী তাহাদের ঘরের দুয়ারে, চৌকাঠে এবং আস্তিনে লিপিবদ্ধ করে; শিশুদিগকে শিক্ষা দেয় এবং নিজেরা কণ্ঠস্থ করে। এই কথা কি

কেহ অনুধাবন করিতে পারে অথবা কোন পবিত্র বিবেক সাক্ষ্য দিতে পারে যে, এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ইহুদীগণ সেই উত্তম শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছে, যাহার উপর তাহাদের মুক্তি নির্ভর করিতেছিল। ইহুদীগণ আজ নয়, বহুদিন হইতে মুক্তি সম্পর্কে একই কথা বলিয়া আসিতেছে যে, তৌরাতে সেই সকল কথা ও শিক্ষাকেই মুক্তির ওপর বলা হইয়াছে, যেগুলিকে কোরআনে মুক্তির উপায় বলা হইয়াছে। পবিত্র কোরআনের নুযুলের সময়ও তাহারা এই সাক্ষ্য দিয়াছে এবং আজও তাহারা এই সাক্ষ্যই দিতেছে। এই সম্পর্কে তাহাদের প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি আমার নিকট আসিয়াছে। যদি ইহুদীগণের মুক্তির জন্য এই অভিশপ্ত কোরবানীর শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই শিক্ষাকে তাহাদিগের গোপন করিয়া রাখিবার কোন কারণ দেখা যায় না। অবশ্য যীশু খ্রীষ্টকে তাহারা 'খোদার পুত্র' বলিয়া না মানিতে পারিত এবং তাঁহার ক্রুশ বিদ্ধ হওয়াকে প্রকৃত পুত্রের ক্রুশ বলিয়া বিশ্বাস করিতে না পারিত এবং বলিতে পারিত যে, যে পুত্রের কোরবানী দ্বারা পৃথিবী মুক্তি লাভ করিবে– তিনি এই ব্যক্তি নহেন; তিনি ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে আগমন করিবেন। কিন্তু যে শিক্ষা তাহাদের ধর্মগ্রন্থে বিদ্যমান এবং যাহা খোদা তা'লার পবিত্র নবীগণ সঞ্জীবিত করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইহুদীগণের সকল ফেরকার পক্ষে একযোগে অস্বীকার করা কখনও সম্ভবপর ছিল না। ইহুদী জাতি আজও আছে এবং তাহাদের মধ্যে আলেম ফাযেলও বিদ্যমান। তাহাদের ধর্মগ্রন্থরাজিও বিদ্যমান। যদি এ সম্পর্কে কাহারও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সে যেন সরাসরি তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। এক বুদ্ধিমান ব্যক্তি, যে প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু, তাহার কি এই বিষয়ে ইহুদীদের সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক নয়? ইহুদীগণ কি এ বিষয়ের প্রথম সাক্ষী নহে? তাহারা শত শত বৎসর হইতে তৌরাতের শিক্ষা মুখস্ত করিয়া আসিতেছে। একজন দুর্বল মানুষকে খোদারূপে উপস্থাপিত করার বিষয়ে পূর্ববর্তী শিক্ষায় কোন কিছুই নাই এবং উহার উত্তরাধিকারীদের কাহারও কোন সাক্ষ্য নাই। পরবর্তী শিক্ষাতেও এরূপ কোনও সাক্ষ্য নাই। তদুপরি, ইহাতে বিবেকেরও সমর্থন নাই। তাঁহাকে (যীশুকে) খোদারও বলা আবার শয়তানেরও বলা, এরূপ বিপরীতমুখী অযৌক্তিক কথাসমূহ বিশ্বাস করা কি সৎ প্রকৃতির লোকের কাজ?

পুনরায়, এই বিশ্বাসকে আর এক দিক দিয়া বিচার করিলে প্রশ্ন জাগে যে, ইহার দ্বারা তৌরাতের উত্তরাধিকার ও পুরাতন শিক্ষার বিরোধিতা করিয়া এক

জনের পাপ অপরের কাঁধে চাপাইয়া এবং একজন সত্যবাদীর হৃদয়কে অভিশপ্ত, খোদা তা'লার নৈকট্যবিহীন ও পরিত্যক্ত এবং শয়তানের অনুরূপ বলিয়া সাব্যস্ত করিবার পর, এই সকল দোষত্রুটি সম্বলিত অভিশপ্ত প্রায়শ্চিত্তবাদ দ্বারা বিশ্বাসীদের কী উপকার হইয়াছে? তাহারা পাপ হইতে কি বিরত হইয়াছে, বা তাহাদের পাপের কি ক্ষমা হইয়াছে? ইহা যাচাই করিলে, উক্ত ধর্ম-বিশ্বাসের আরও অসারতা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, বাস্তব অবস্থা তাহাদের পাপ হইতে বিরত থাকা ও পবিত্রতা অর্জন করার স্পষ্ট বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। খ্রীষ্টানদের ধারণা মতে হযরত দাউদ (আ.)-ও যীশুর প্রায়শ্চিত্তবাদের প্রতি বিশ্বাস রাখিতেন। কিন্তু তাহাদের কথামত দাউদ (আ.) ঈমান আনা সত্ত্বেও (নাউযুবিল্লাহ) একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন ও তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছিলেন এবং প্রবৃত্তি চরিতার্থে খেলাফতের অর্থভাণ্ডার হইতে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি একশত পর্যন্ত বিবাহ করিয়াছিলেন।[১] শেষ জীবন পর্যন্ত এই পাপে নিমজ্জিত ছিলেন এবং প্রতিদিন অন্যায় পাপে লিপ্ত থাকিতেন। অতএব যীশুর অভিশপ্ত

টীকা-১: ["দাউদের মহাপাপের বিবরণ" শীর্ষ দিয়া ২ সমুয়েল, ১১ অধ্যায়ে লিখিত আছে: "একদা বৈকালে দাউদ শয্যা হইতে উঠিয়া রাজবাড়ীর ছাদে বেড়াইতেছিলেন, আর ছাদ হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একটি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছে: স্ত্রীলোকটি দেখিতে বড়ই সুন্দরী ছিল। দাউদ তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লোক পাঠাইলেন। একজন কহিল, এ কি ইলিয়ামের কন্যা, হিত্তীয় উরিয়ের স্ত্রী বৎসেবা নয়? তখন দাউদ দূত পাঠাইয়া তাহাকে আনাইলেন, এবং সে তাঁহার নিকট আসিলে দাউদ তাহার সহিত শয়ন করিলেন; সে স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া শুচি হইয়াছিল। পরে সে আপন ঘরে ফিরিয়া গেল; পরে সে স্ত্রী গর্ভবতী হইল; আর লোক পাঠাইয়া দাউদকে এই সমাচার দিল, আমার গর্ভ হইয়াছে।

তখন দাউদ যোয়াবের ('রব্বা' নগর অবরোধে লিপ্ত সেনাপতি– অনুবাদক) নিকটে লোক পাঠাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন, হিত্তীয় উরিয়কে আমার নিকট পাঠাইয়া দেও। তাহাতে যোয়াব দাউদের নিকটে উরিয়কে পাঠাইলেন। পরে দাউদ উরিয়কে কহিলেন, তুমি আপন বাড়ীতে গিয়া পা ধোও। তখন উরিয়া রাজবাড়ী হইতে বাহির হইল, আর রাজার নিকট হইতে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ভেট গেল। কিন্তু উরিয়া আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে রাজবাড়ীর দ্বারে শয়ন করিল, ঘরে গেল না। পরে এই কথা দাউদকে বলা হইল যে, উরিয় ঘরে যায় নাই। দাউদ উরিয়কে কহিলেন, তুমি কি পথ ভ্রমণ করিয়া আইস নাই? তবে কেন বাড়ীতে গেলে না? উরিয় দাউদকে কহিল, সিন্দুক,

কোরবানী যদি মানুষকে পাপ হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিত তাহা হইলে তাহাদের কথা মত দাউদ (আ.) এইভাবে পাপে নিমগ্ন থাকিতেন না। এইভাবে যীশুর তিন নানী ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলেন।[২] অতএব ইহার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যদি যীশুর অভিশপ্ত কোরবানীর প্রতি ঈমান আনিলে

চলমান টীকা-১:

ইস্রায়েল ও যিহূদা কুটীরে বাস করিতেছে, এবং আমার প্রভু যোয়াব ও আমার প্রভুর দাসগণ খোলামাঠে ছাউনী করিয়া আছেন; তবে আমি কি ভোজন পান করিতে ও স্ত্রীর সহিত শয়ন করিতে আপন গৃহে যাইতে পারি? আপনার জীবনের ও আপনার জীবিত প্রাণের দিব্য, আমি এমন কর্ম করিব না। তখন দাউদ উরিয়কে কহিলেন, অদ্যও তুমি এই স্থানে থাক, কল্য তোমাকে বিদায় করিব। তাহাতে উরিয় সে দিবস ও পর দিবস যিরুশালেমে রহিল। আর দাউদ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলে, সে তাহার সাক্ষাতে ভোজন পান করিল; আর তিনি তাহাকে মত্ত করিলেন; কিন্তু সে সন্ধ্যাকালে আপন প্রভুর দাসগণের সঙ্গে আপন শয্যায় শয়ন করিবার জন্য বাহিরে গেল, ঘরে গেল না। প্রাতঃকালে দাউদ যোয়াবের নিকটে এক পত্র লিখিয়া উরিয়ের হাতে পাঠাইলেন, পত্রখানিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তোমরা এই উরিয়কে তুমুল যুদ্ধের সম্মুখে নিযুক্ত কর, পরে ইহার পশ্চাত হইতে সরিয়া যাও, যেন এ আহত হইয়া মারা পড়ে। কোন্ স্থানে বিক্রমশালী লোক আছে, তাহা জানাতে, যোয়াব নগর অবরোধকালে, সেই স্থানে উরিয়কে নিযুক্ত করিলেন। পরে নগরস্থ লোকেরা বাহির হইয়া যোয়াবের সহিত যুদ্ধ করিলে, কয়েকজন লোক, দাউদের দাসদের মধ্যে কয়েকজন, পতিত হইল, বিশেষতঃ হিত্তীয় উরিয়ও মারা পড়িল।" [ঐ ২-১৭ পদ]

"আর উরিয়ের স্ত্রী আপন স্বামী উরিয়ের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া স্বামীর জন্য শোক করিল। পরে শোক অতীত হইলে দাউদ লোক পাঠাইয়া তাহাকে আপন বাড়ীতে আনাইলেন, তাহাতে সে তাহার স্ত্রী হইল ও তাঁহার জন্য পুত্র প্রসব করিল। কিন্তু দাউদের কৃত এই কর্ম সদা প্রভুর দৃষ্টিতে মন্দ হইল।" [ঐ, ২৬-২৭ পদ]

"যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলী পত্র, তিনি দাউদের সন্তান, আব্রাহামের সন্তান।"

'মথি' লিখিত সুসমাচার, প্রথম অধ্যায়, প্রথম পদ।] [অনুবাদক]

টীকা-২: [মথি প্রথম অধ্যায়ে যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলী পত্রে তামর, রাহব ও উরিয়ের বিধবা (বৎসেবা) মাতৃকুল প্রধানা ত্রি নারীর নাম বর্ণিত আছে। [মথি, প্রথম অধ্যায় ৩, ৫ ও ৬ পদ]। বাইবেলের পুরাতন বিধানে (Old Testament-এ) এই তিন নারীর ভ্রষ্টা ও ব্যভিচারিণী হওয়ার কথা লিখিত আছে।

(ক) রাহব সম্বন্ধে যিহোশূয়, ২য় অধ্যায়, ১ম পদে লিখিত আছে: "তখন তাহারা গিয়া রাহব নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে শয়ন করিল।"

অন্তরের শুচিতা লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার নানীরা নিশ্চয়ই এই বিশ্বাস দ্বারা উপকৃত হইতেন এবং এই ভাবে লজ্জাকর কাজে লিপ্তা হইতেন না।

যীশুর শিষ্যগণও ঈমান আনার পর লজ্জাকর পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা ত্রিশ টাকায় যীশুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। পিতরও যীশুর সামনে দাঁড়াইয়া তিন বার তাঁহাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নবীকে অভিশাপ দেওয়া মহাপাপ। আজকাল ইউরোপে মদ্যপান ও ব্যভিচারের তুফান যেভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা লিখার প্রয়োজন পড়ে না। কয়েকজন সম্মানিত পাদ্রী সাহেবের ব্যভিচারের কাহিনী ইউরোপের সংবাদ পত্রে হাওয়ালা দিয়া ইতিপূর্বে আমার কোন প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছি। এই সব ঘটনাবলীর দ্বারা পূর্ণভাবে ইহা সাব্যস্ত হয় যে, এই অভিশপ্ত কোরবানী, পাপ রোধ করিতে পারে নাই।

এই বিষয়ের আর এক দিক হইল, যদি এই অভিশপ্ত কোরবানী পাপ রোধ করিতে না পারে, তাহা হইলে কি ইহার দ্বারা চিরকাল ব্যাপী পাপের ক্ষমা হইতে থাকিবে। ইহা যেন পাপ খণ্ডনের এমন একটি ব্যবস্থাপত্র, যদ্বারা এক দুরাচার অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়া, চুরি করিয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া, কাহারও সম্পদ ও সম্মান নষ্ট করিয়া, অথবা কাহারও অর্থ অন্যান্যভাবে

চলমান টীকা-২:

(খ) তামর সম্বন্ধে আদি পুস্তক, ৩৮ অধ্যায়, ১৫-১৯ পদে লিখিত আছে যে, সে শ্বশুরের সহিত ব্যভিচার করিয়াছিল:

"পরে যিহূদা তাহাকে দেখিয়া বেশ্যা মনে করিল, কেননা সে মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিল। অতএব, সে পুত্রবধুকে চিনিতে না পারাতে পথের পার্শ্বে তাহার নিকটে গিয়া কহিল, আইস, আমি তোমার কাছে গমন করি। তামর কহিল, তোমার কাছে আসিবার জন্য আমাকে কি দিবে? সে কহিল, পাল হইতে একটি ছাগ বৎস পাঠাইয়া দিব। তামর কহিল, যাবৎ তাহা না পাঠাও তাবৎ আমার কাছে কি কিছু বন্ধক রাখিবে? সে কহিল, কি বন্ধক রাখিব? তামর কহিল, তোমার এই মোহর ও সুত্র ও হস্তের যষ্টি। তখনও সে তাহাকে সেইগুলি দিয়া তাহার কাছে গমন করিল; তাহাতে সে তাহা হইতে গর্ভবতী হইল।"

(গ) উরিয়ের বিধবা (বৎসেবা) সম্বন্ধে ২ শামুয়েল, ১১ অধ্যায় হইতে দাউদের মহাপাপ সংক্রান্ত উদ্ধৃতি আমরা দিয়াছি। ৩-৪ পদ দ্রষ্টব্য।] (অনুবাদক)

আত্মসাৎ করিয়া, অভিশপ্ত কোরবানীর উপর বিশ্বাস আনিয়া খোদার বান্দাদের অধিকার নষ্ট করিতে থাকিবে। এইভাবে কোন ব্যক্তি সর্বদা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিয়া একমাত্র লানতী কোরবানীতে বিশ্বাস রাখার ফলে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। অতএব, ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা কখনও হইতে পারে না। পরন্তু এইভাবে পাপ করিয়া অভিশপ্ত কোরবানীর আশ্রয় গ্রহণ করা বদমায়েশী পন্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনে হয়, পৌলের মনেও কম্পন আরম্ভ হইয়াছিল যে, এই বিধান ঠিক নহে। এই জন্যই তিনি বলিয়াছিলেন, "যীশুর কোরবানী প্রথম পাপের জন্য এবং যীশু দ্বিতীয় বার ক্রুশে মরিতে পারেন না"; কিন্তু ইহা বলিয়া তিনি বড় বিপাকে পড়িয়া গিয়াছেন। কেননা এই কথা যদি ঠিক হয় যে, যীশুর অভিশপ্ত কোরবানী প্রথমবারের পাপের জন্য, তাহা হইলে দাউদ নবী, নাউযুবিল্লাহ্, চিরস্থায়ী দোযখের উপযুক্ত। কারণ খ্রীষ্টানদের কথা মত তিনি হিত্তীয় ঊরিয়ের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার পর খোদা তা'লার অনুমতি ছাড়া তাহাকে চিরদিন তাঁহার ঘরে রাখিয়াছিলেন। এবং তিনিই ছিলেন মরিয়মের মাতাগণের তালিকায় ঈসার সতী সাধ্বী নানী। ইহা ব্যতীত দাউদ (আ.) এক শত বিবাহ করিয়াছিলেন, যাহা খ্রীষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসানুযায়ী তাঁহার জন্য বৈধ ছিল না। অতএব, ইহা তাঁহার জন্য প্রথম পাপ রহিল না। পরন্তু উহা বার বারই অনুষ্ঠিত হইতে থাকিল এবং প্রত্যেক দিন উহা নূতন করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে লাগিল। যখন 'অভিশপ্ত কোরবানী' পাপ রোধ করিতে পারে না, তখন সাধারণ খ্রীষ্টানদের দ্বারাও নিশ্চয়ই পাপ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং এখনও হইতেছে। অতএব পৌলের নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় (বারের) পাপ ক্ষমার যোগ্য নহে এবং চিরস্থায়ী দোযখ ইহার শাস্তি।[৩] এই হিসাবে কোন খ্রীষ্টানই চিরস্থায়ী দোযখ হইতে মুক্তি পাইবার যোগ্য সাব্যস্ত হয় না। মিয়াঁ সিরাজ উদ্দীনকে দূরে যাইতে হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি

টীকা-৩: [আর যেমন মানুষের নিমিত্ত একবার মৃত্যু, তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে, তেমনি খ্রীষ্টও অনেকের পাপ-ভার তুলিয়া লইবার নিমিত্ত একবার উৎসৃষ্ট হইয়াছেন।" (ইব্রীয় ৯:২৭-২৮)

"কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পাইলে পর যদি আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক পাপ করি, তবে পাপার্থক আর কোন যজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে না, কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত অগ্নির চণ্ডতা" (ইব্রীয়, ১০:২৬-২৭)] (অনুবাদক)

নিজের অবস্থাই দেখুন। প্রথমে তিনি মরিয়মের পুত্রকে খোদার পুত্র স্বীকার করিয়া অভিশপ্ত কোরবানীর ব্যাপ্টিজম লইয়াছিলেন। পরে কাদিয়ান আসিয়া তিনি নূতনভাবে মুসলমান হন এবং স্বীকার করেন যে, আমি ব্যাপ্টিজম লইতে তাড়াহুড়া করিয়াছিলাম। এবং অনেক দিন তিনি এখানে নামায পড়েন। অভিশপ্ত কোরবানীর অসারতা তিনি পূর্ণভাবে বুঝিয়া ফেলিয়াছেন এবং উক্ত বিশ্বাসকে তিনি ভ্রান্ত মনে করেন। কিন্তু কাদিয়ান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আবার পাদ্রীদের ফাঁদে পড়িয়া খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেন। এখন মিয়াঁ সিরাজ উদ্দীন নিজেই চিন্তা করুন যে, প্রথম বার ব্যাপ্টাইজ হইবার পর তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম হইতে ফিরিয়া কথা ও কাজে উহার বিরোধিতা করেন। ইহা খ্রীষ্টান নীতি অনুযায়ী এক মহাপাপ ছিল, যাহা দ্বিতীয় বার তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে। অতএব, পৌলের কথানুসারে এই পাপ কখনও খণ্ডন হইবে না। কারণ, ইহার জন্য দ্বিতীয় বার ক্রুশীয় মৃত্যুর প্রয়োজন।

যদি এই কথা বলেন যে, পৌল ভুল করিয়াছে বা মিথ্যা বলিয়াছে এবং প্রকৃত কথা এই যে, অভিশপ্ত কোরবানীর প্রতি ঈমান আনিলে কোন পাপ থাকে না এবং চুরি, ব্যভিচার, হত্যা, মিথ্যা বলা, আমানত খেয়ানত করা, বা যে কোন প্রকারের পাপই হউক না কেন- উহার কোন শাস্তি হইবে না; তাহা হইলে ইহা এক অপবিত্রতা সম্প্রসারণকারী ধর্ম হইবে। যাহারা এই জাতীয় বিশ্বাস রাখে, তাহাদিগের নিকট হইতে সমসাময়িক সরকারের জামানত গ্রহণ করা কর্তব্য। পুনরায় যদি এই ধারণা পেশ করা হয় যে, অভিশপ্ত কোরবানীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সত্যিকারের শুদ্ধি অর্জন করে এবং পাপ হইতে পবিত্র হয়, তাহা হইলে ইহার উত্তর আমি পূর্বেই দিয়াছি যে, ইহা কখনও ঠিক নহে। আমি ইতিপূর্বেই (বাইবেলের বরাত দিয়া) দাউদ নবীর পাপ, যীশুর নানীদের পাপ এবং পাদ্রী সাহেবদের পাপের কথা উল্লেখ করিয়াছি। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, আজকাল ইউরোপ পাপ কাজে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে যদি কাহারও জীবনকে পবিত্র বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে, ইহার প্রমাণ কি যে, তাহার জীবন পবিত্র? অনেক বদমায়েশ, হারাম ভক্ষণকারী, নির্লজ্জ ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী, খোদাকে অস্বীকারকারী বাহ্যতঃ পবিত্র জীবন দেখাইতে পারে; কিন্তু অভ্যন্তরে ঐ সকল ব্যক্তির জীবন একটি কবরের ন্যায়, যাহার মধ্যে পূতিগন্ধময় মৃতদেহ এবং নরকঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই নাই।

এই ধারণা করাও অন্যায় যে, প্রকৃতিগতভাবে কোন জাতির সকলেই পবিত্র, বা সকলেই বদমায়েশ। বরং আমরা দেখি যে, আল্লাহ্ তা'লার বিধান প্রত্যেক জাতিকেই এই দাবী করিবার অধিকার দিয়াছে যে, যেভাবে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবতঃ চরিত্রহীন, অশিষ্ট, কদাচারী এবং অন্যের অকল্যাণকামী রহিয়াছেন তেমনি তাহাদের মধ্যে স্বভাবতঃ কিছু হৃদয়বান, সৎ-স্বভাববিশিষ্ট, সদাচারী এবং পরহীতকামী লোকও আছেন। এই বিধান হইতে হিন্দু, পার্সী, ইহুদী, শিখ, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, এমন কি, ডোম-চণ্ডালও বহির্ভূত নহে। লোক যতই সভ্যতা ও ভদ্রতার দিকে অগ্রসর হয় এবং জাতির মধ্যে সমষ্টিগতভাবে জ্ঞান, সম্মান এবং আত্মমর্যাদার রঙ ধারণ করে, ততই তাহাদের সৎ-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ পবিত্র জীবন এবং উক্ত চালচলনে খ্যাতি অর্জন করিতে থাকেন এবং গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যদি সকল জাতির মধ্যে স্বাভাবিক সৎ-স্বভাবের গুণ না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম পরিবর্তনের দ্বারাও উক্ত গুণ জন্মান সম্ভব হইত না। কারণ, খোদার দেওয়া স্বভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন নাই। যদি প্রকৃত সত্যের জন্য কাহারও ক্ষুধা ও পিপাসা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, ধর্মের অস্তিত্বের পূর্বেই মানব প্রকৃতির মধ্যে খোদা-প্রদত্ত গুণের বণ্টন হইয়া গিয়াছে। কাহারও স্বভাবে ধৈর্য ও প্রেমের এবং কাহারও স্বভাবে কঠোরতা ও ক্রোধের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, সেই প্রেম, আনুগত্য, সাধুতা এবং বিশ্বস্ততা, যাহা একজন মূর্তি বা মানুষ পূজক সৃষ্টির পূজায় ব্যবহার করিয়া থাকে সেই সব সংকল্পকে খোদার প্রতি নিবদ্ধ করে এবং সেই আনুগত্যকে খোদার পথে প্রদর্শন করে। মানবীয় শক্তিনিচয়ের উপর ধর্মের প্রভাব কী, ইঞ্জিলে ইহার কোন উত্তর নাই। কারণ ইঞ্জিল প্রজ্ঞার পথসমূহ হইতে দূরে। কিন্তু কোরআন শরীফ পুনঃপুনঃ বিস্তারিত বর্ণনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ধর্মের কাজ, মানব প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো বা নেকড়ে বাঘকে ছাগল করিয়া দেখানো নহে। ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হইল, সেই সব শক্তি, যাহা মানব স্বভাবে রহিয়াছে, এগুলি স্থান কাল উপযোগী কাজে লাগাইবার পথ প্রদর্শন করা। ধর্মের এ শক্তি নাই যে, কাহারও স্বভাব-জাত গুণের পরিবর্তন ঘটায়। উহার শুধু এই অধিকার আছে যে, সেই সকল গুণকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার উপদেশ দেয়। একটি মাত্র গুণ, যথা- দয়া বা ক্ষমার প্রতি যেন জোর না দেয়, বরং যাবতীয় বৃত্তিগুলিকেই কাজে লাগাইবার জন্য উপদেশ দেয়। কারণ, মানুষের কোন বৃত্তিই মন্দ নহে, বরং উহাদের প্রয়োগের কালে

বাড়াবাড়ি কম বেশী করা বা অপব্যবহার করার অনুপাতেই মন্দ ঘটে। স্বভাবজাত কোন বৃত্তির জন্য কেহ ভর্ৎসনার পাত্র হয় না, বরং উহার অপব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনার যোগ্য হয়। ফলতঃ স্রষ্টা কর্তৃক স্বভাবজাত গুণের বণ্টন সকল জাতির জন্য সমান। যেরূপ তিনি বাহ্যিক নাক, চোক, মুখ, হাত, পা ইত্যাদি সকল জাতির মানুষকে দিয়াছেন, ঠিক সেইরূপে অভ্যন্তরীণ বৃত্তিনিচয়ও তিনি সকলকে দিয়াছেন। প্রত্যেক জাতির মধ্যেই মিতাচার এবং নরম ও চরম মেযাজের দিক দিয়া ভাল ও মন্দ মানুষ পাওয়া যায়। ধর্মের প্রভাবে কোন জাতির ভাল হওয়ার কিংবা ধর্ম কোন জাতির ভদ্রতার মূল কারণ হওয়া তখনই প্রমাণিত হইবে, যখন সেই ধর্মের পূর্ণ অনুগামীদের মধ্যে কোন কোন এমন আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায়, যাঁহার তুলনা অন্য কোন ধর্মের অনুসারীর মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং আমি জোরের সহিত দাবী করিতেছি যে, এই বৈশিষ্ট্য ইসলামের আছে। ইহা হাজার হাজার ব্যক্তিকে পবিত্র জীবনের এরূপ ঊর্ধ্ব মার্গে উন্নীত করিয়াছে যে, তাঁহাদের সম্পর্কে বলা হয়, 'খোদা তা'লার রূহ যেন তাঁহাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করিয়া আছে।' কবুলিয়তের জ্যোতিঃ তাঁহাদের মধ্যে এমন উজ্জ্বল হইয়াছে যেন তাঁহারা খোদা তা'লার বিকাশস্থল। এই জাতীয় মহামানব প্রত্যেক শতাব্দীতেই ইসলামের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবন প্রমাণহীন নহে বা মৌখিক দাবীর ওপর প্রতিষ্ঠিত নহে, বরং স্বয়ং খোদা তা'লা সাক্ষ্য দেন যে, তাঁহাদের জীবন পবিত্র।

কোরআন শরীফে অতি উত্তম পর্যায়ের পবিত্র জীবনের লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই স্তরের মানুষের দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশিত হয় এবং খোদা তা'লা তাঁহাদের দোয়া কবুল করেন ও তাঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করেন। যাথাসময়ের পূর্বে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সংবাদ দেওয়া হয় এবং খোদা তাঁহাদিগকে সাহায্য করেন। অতএব, আমরা দেখিতেছি, ইসলাম ধর্মে হাজার হাজার মানুষ এইভাবে আবির্ভূত হইয়া আসিতেছেন। তদনুযায়ী বর্তমান যুগে এই অধম উক্ত নমুনা দেখাইতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু খ্রীষ্টানদের মধ্যে এইরূপ মানব কোথায় এবং কোন দেশে বাস করে, যাঁহারা ইঞ্জিলের বর্ণিত লক্ষণ অনুযায়ী তাঁহাদের প্রকৃত ঈমান এবং পবিত্র জীবনের প্রমাণ দিতে পারেন? প্রত্যেক বস্তুই উহার নিদর্শন দ্বারা পরিচিত হয়। যথা, বৃক্ষ ফল দ্বারা পরিচিত হয়। যদি পবিত্র জীবনের শুধু দাবীই থাকে এবং ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত

নিদর্শন সেই দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে সেই দাবী অচল। ইঞ্জিল কি প্রকৃত ও সত্যিকার ঈমানের কোন নিদর্শন লিখে নাই? ঐ নিদর্শনাবলী কি উহাতে অসাধারণভাবে বর্ণিত হয় নাই? যদি ইঞ্জিলে সত্যিকার ঈমানের নিদর্শন বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক ঈমানের দাবীদার খ্রীষ্টানের ঈমান, ইঞ্জিলে বর্ণিত লক্ষণ দ্বারা যাচাই করা উচিত। একজন বড় সম্মানিত পাদ্রী এবং একজন দরিদ্র হইতে দরিদ্র মুসলমানের সহিত আধ্যাত্মিক আলো এবং কবুলিয়তের মোকাবেলা করিয়া দেখা যাউক, ইহাতে যদি দরিদ্র মুসলমানের মোকাবেলায় সেই পাদ্রীর মধ্যে স্বর্গীয় আলোর কিছু অংশও পাওয়া যায, তাহা হইলে আমি যাবতীয় শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। এই জন্য আমি এ সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের সহিত মোকাবেলার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়াছি। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি এবং আমার খোদাও সাক্ষী যে, প্রকৃত ঈমান এবং সত্যিকারের পবিত্র জীবন, যাহাতে ঐশী জ্যোতিঃ লাভ করা যায়, তাহা ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায়ে পাওয়া সম্ভবপর নহে। এই পবিত্র জীবন-যাহা আমি লাভ করিয়াছি- ইহা শুধু আমার মৌখিক ফাঁকা দাবী নহে। ইহাতে স্বর্গীয় সাক্ষ্য রহিয়াছে। ঐশী সাক্ষ্য ব্যতিরেকে কোন পবিত্র জীবন প্রমাণিত হইতে পারে না এবং কাহারও গোপন কপটতা এবং বেইমানী সম্পর্কে আমরা অবগত হইতে পারি না। যখন ঐশী সাক্ষ্য প্রাপ্ত পবিত্রচিত্ত মানব কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায়, তখন জাতির অবশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁহাদিগকে বাহ্যতঃ পবিত্র দেখায়, তাঁহাদিগকেও পবিত্র মনে করিতে হইবে। কারণ জাতির দৃষ্টান্ত এক দেহের ন্যায় এবং একই আদর্শ দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে যে, উক্ত জাতি স্বর্গীয় পবিত্র জীবন পাইবার অধিকারী।[৪]

ইহার ওপর ভিত্তি করিয়াই আমি খ্রীষ্টাদিগকে একটি চূড়ান্ত প্রামাণ্য ইশ্‌তেহার দিয়াছিলাম। যদি তাহারা সত্যান্বেষী হইত, তাহা হইলে তাহারা এই দিকে দৃষ্টিপাত করিত। আমি এখনও বলিতেছি যে, খ্রীষ্টানদেরও ঈমান এবং পবিত্র জীবনের দাবী আছে এবং মুসলমানদেরও। এখন বিচার্য বিষয় এই, এতদুভয়ের মধ্যে খোদা তা'লার নিকট কাহার ঈমান গ্রহণীয়, কাহার জীবন সত্যই পবিত্র এবং কাহার ঈমান কেবলমাত্র শয়তানী চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ এবং

টীকা-৪ঃ এস্থানে পুরাতন কাহিনী পেশ করা নিরর্থক। বর্তমান ঘটনাবলী ইহার মোকাবেলায় দেখান উচিত। –গ্রন্থকার

পবিত্র জীবনের দাবী কেবল দৃষ্টিহীনতার ধোকা মাত্র। সুতরাং, আমার নিকট সেই ঈমান খাঁটি এবং গ্রহণীয়, যে ঈমানের সঙ্গে ঐশী সাক্ষ্য ও কবুলিয়তের নিদর্শন রহিয়াছে। এইভাবে প্রকৃত পবিত্র জীবন উহাই, যাহার সহিত ঐশী সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কারণ শুধু দাবীই যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে এই দাবী প্রত্যেক জাতিই করিয়া থাকে যে, তাহাদের মধ্যে পবিত্র জীবনধারী বহু মহামানব অতীত হইয়াছেন এবং বিদ্যমান আছেন। অধিকন্তু তাহাদের কার্যাবলী এবং আমলও পেশ করিয়া থাকে, যাহার অভ্যন্তরীণ সত্যতার মীমাংসা করা কঠিন। অতএব, খ্রীষ্টানদের যদি এই ধারণা থাকে যে, প্রায়শ্চিত্তবাদ দ্বারা পবিত্র ঈমান এবং পবিত্র জীবন লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্তব্য যেন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া দোয়ার কবুলিয়ত এবং নিদর্শন প্রকাশের ব্যাপারে আমার সহিত মোকাবেলা করিয়া দেখিয়া লয়। যদি ঐশী নিদর্শন দ্বারা তাহাদের জীবন পবিত্র প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমি যে কোন শাস্তি গ্রহণে এবং সর্ব-প্রকার অপমান বরণ করিতে প্রস্তুত। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠিতে খ্রীষ্টানদের জীবন একেবারেই অপবিত্র। সেই পবিত্র খোদা যিনি আসমান ও জমিনের খোদা– তিনি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সেইরূপ ঘৃণা করেন যেরূপ আমরা পূতিগন্ধময় গলিত লাশকে ঘৃণা করি। আমি যদি এ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া থাকি এবং এই কথায় খোদা আমার স্বপক্ষে না থাকেন, তাহা হইলে ধীর ও সুস্থিরভাবে আমার সহিত মীমাংসা করিয়া ফেলুন। আমি আবার বলিতেছি যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে সেই পবিত্র জীবন নাই, যাহা আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অন্তরকে আলোকিত করে; বরং যেভাবে আমি আলোচনা করিয়া আসিয়াছি যে, স্বাভাবিকভাবে কাহারও ভাল হওয়া যেরূপ অন্যান্য সাধারণ জাতিগণের মধ্যে পাওয়া যায়, এখানে সেই স্বাভাবিক শিষ্টাচার সম্পর্কে কিছু বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই ধরনের সৎ ও নম্র লোক অল্প বিস্তর প্রত্যেক জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়। এমন কি মুচি, মেথরও ইহার বাহিরে নহে। কিন্তু আমার কথা হইল, স্বর্গীয় পবিত্র জীবন সম্পর্কে, যাহা খোদা তা'লার কালামের সাহায্যে লাভ করা যায় এবং স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয় এবং যাহার সহিত স্বর্গীয় নিদর্শন থাকে। কিন্তু এই জাতীয় জীবন খ্রীষ্টানগণের মধ্যে নাই। এখন কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিক যে, অভিশপ্ত কোরবানী কি উপকারে আসিল?

খ্রীষ্টানগণ পরিত্রাণের যে পন্থা যীশুর প্রতি আরোপ করিয়া থাকে, উহার

বিস্তারিত আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন মনে জাগে যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষাও কি এই অভিশপ্ত কোরবানী ও অভিশপ্ত ভালবাসা মানব জাতির পবিত্রতা এবং মুক্তির জন্য পেশ করিতেছে? অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা পেশ করিতেছে? ইহার উত্তর এই যে, এরূপ কোন ঘৃণা ও অপবিত্র পন্থা হইতে ইসলাম একেবারে পবিত্র। ইসলাম কোন অভিশপ্ত কোরবানীও পেশ করে না এবং কোন অভিশপ্ত ভালবাসাও পেশ করে না। পক্ষান্তরে, ইসলাম আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, সত্যিকারের পবিত্রতা লাভের জন্য আমরা যেন আমাদের জীবনের পবিত্র কোরবানী পেশ করি, যাহা আন্তরিকতার বারি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে এবং সততা ও ধৈর্যের আগুন দ্বারা শোধন করা হইয়াছে। যথা–

بَلٰى ۩ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗۤ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

অর্থাৎ- "যাহারা খোদার নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং স্বীয় জীবন তাঁহার পথে উৎসর্গ করে এবং নেক কাজে উৎসাহী হয়, তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্‌র নৈকট্যের উৎস হইতে পুরষ্কার পাইবে। তাহাদের উপর কোন ভয় আসিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।" (সূরা আল্ বাকারা: ১১৩) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার যাবতীয় শক্তি খোদার পথে নিয়োজিত করে এবং একমাত্র খোদা তা'লার জন্যই তাহারা যাবতীয় কথা, কাজ, চলাফেরা, অবস্থান– এক কথায় সমস্ত জীবনই আল্লাহ্‌কে সোপর্দ করে ও সৎ কাজ করিতে উৎসাহী থাকে, খোদা নিজের নিকট হইতে তাহাকে পুরস্কার দিবেন এবং ভয়ভীতি ও দুঃখ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। মনে রাখিবেন, ইসলাম শব্দ, যাহা এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোরআন শরীফে ইহাকে অন্য কথায় এস্তেকামাত (ধৈর্য) নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যেমন কোরআন এই দোয়া শিখাইতেছে:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

অর্থাৎ- আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাঁহাদের পথে যাঁহারা তোমার নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের জন্য স্বর্গীয় পথ খোলা হইয়াছে।" (সূরা আল্ ফাতেহা: ৬-৭) এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন

যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহার সরল-সুদৃঢ় পথের স্বরূপ নিরূপণ করা হয়। এবং মানব জীবনের লক্ষ্য ইহাই যে, তাহাকে খোদার প্রেমের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষকে যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, অতএব তাহার জন্য নির্ধারিত সরল-সদৃঢ় পথ হইল প্রকৃতভাবে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করা। যখন সে তাহার যাবতীয় শক্তির মাধ্যমে খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করিবে, তখন অবশ্য তাহার জন্য পুরস্কার অবতীর্ণ হইবে, যাহাকে অপর কথায় পবিত্র জীবন নামে অভিহিত করা যায়। যেমন, তোমরা দেখ সূর্যের দিকের জানালা যখন খুলিয়া দেওয়া হয়, তখন সুনিশ্চিতভাবে সূর্যের আভা ভিতরে আসিয়া পড়ে, তেমনই মানুষ যখন খোদা তা'লার দিকে একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহার ও খোদা তা'লার মধ্যে কোন আড়াল থাকে না, তখনই এক জ্যোতির্ময় আলো তাহার উপর অবতীর্ণ হয় এবং তাহাকে আলোকিত করে ও তাহার অভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা ধৌত করিয়া দেয়। তখন তাহার মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং সে এক নূতন মানুষ হইয়া যায়, তখনই বলা যায় যে, তাহার পবিত্র জীবন লাভ হইয়াছে। এই পৃথিবীই এই পবিত্র জীবন লাভের স্থান। ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই আল্লাহ্ তা'লা বলিয়াছেন:

مَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝

অর্থাৎ, "যে-ব্যক্তি, ইহকালে অন্ধ থাকে এবং খোদাকে দেখিবার আলো পায় নাই, সে পরকালে অন্ধই থাকিবে।' (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৩)

মোট কথা, খোদা তা'লাকে দেখিবার জন্য মানুষ এই জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি লইয়া যায়।

যাহারা ইহজগতে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির শক্তি অর্জন করে নাই, তাহাদের ঈমান কেস্সা কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাহারা চির অন্ধকারে থাকিবে। ফল কথা, পবিত্র জীবন ও প্রকৃত মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা যেন সম্পূর্ণরূপে খোদা তা'লার হইয়া যাই এবং অকপট বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার দ্বারে পড়িয়া থাকি। অধিকন্তু সৃষ্টি বস্তুকে খোদা বলার অপকর্ম হইতে যেন দূরে থাকি। যদিও নিহত হই, খণ্ড-বিখণ্ড হই ও আগুনে জ্বলিতে থাকি, তথাপি আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের উপর

আমাদের রক্তের মোহর মারিয়া দিই। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ধর্মের নাম ইসলাম রাখিয়াছেন। ইহার দ্বারা সঙ্কেত করা হইয়াছে যে, আমরা খোদা তা'লার সমক্ষে মস্তক রাখিয়া দিয়াছি। প্রাকৃতিক বিধানও পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, কোরআন শরীফে পবিত্রতা ও প্রকৃত মুক্তি লাভের যে পথ দেখান হইয়াছে, জড় জগতেও এই বিধান দৃষ্ট হয়। উত্তম খাদ্যের অভাবে এবং অখাদ্য খাওয়ার ফলে অনেক রোগ দেখা দেয়। প্রকৃতিতে ইহার প্রতিকার উপযুক্ত পথ্য গ্রহণ করা এবং অপথ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিবে সজীবতা রক্ষার জন্য উহার মধ্যে দুইটি ক্রিয়া আছে। প্রথমতঃ উহা মাটির মধ্যে নিজ শিকড় গাড়িতে থাকে, যেন উহা মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শুকাইয়া না যায়। দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষ উহার শিকড়ের নল যোগে মাটির রস টানিতে থাকে এবং এইভাবে উহা বাড়িতে থাকে। এই বিধানই আল্লাহ্ তা'লা মানুষের জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মানুষ তখনই কৃতকার্য হইতে পারে, যখন প্রথমতঃ সে সততা ও দৃঢ়তার সহিত খোদা তা'লার মধ্যে নিজ সত্তাকে মজবুতভাবে নিবদ্ধ করে, ক্ষমা প্রার্থনার (এস্তেগফারের) সাহায্যে নিজ শিকড়কে খোদা তা'লার প্রেমে প্রোথিত করে এবং ইহার পর বাক্যে ও কার্যে তওবার মাধ্যমে খোদার দিকে অবনত হইয়া বিনয় ও নম্রতার নির্ঝর দিয়া আপন প্রভুর করুণাবারি আকর্ষণ করে এবং উক্ত পানির দ্বারা পাপের শুষ্কতা ধৌত করিয়া ফেলে এবং দুর্বলতা দূর করে।

এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার দ্বারা ঈমানের মূল দৃঢ় হয়। কোরআন শরীফে উহা দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এক হইল, নিজ হৃদয়কে খোদার প্রেমে শক্তিশালী করিয়া পাপের প্রকাশকে বাধা দেওয়া, যাহা বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য চাওয়া। ইহাই নৈকট্যপ্রাপ্তগণের এস্তেগফার। তাঁহারা এক নিমেষও খোদা তা'লা হইতে পৃথক হওয়াকে নিজেদের ধ্বংসের কারণ বলিয়া মনে করেন। এইজন্য তাহারা এস্তেগফার করেন, যেমন খোদা তা'লা তাঁহাদিগকে স্বীয় প্রেমে ধারণ করিয়া রাখেন। দ্বিতীয় প্রকার এস্তেগফার হইল, পাপ হইতে বাহির হইয়া খোদা তা'লার দিকে ধাবিত হওয়া এবং বৃক্ষ যেমন মাটিতে লাগিয়া বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পবিত্র পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পাপের শুষ্কতা এবং অধঃপতন হইতে রক্ষা পায়। এই দুই প্রকারের অবস্থার নাম 'এস্তেগফার'

রাখা হইয়াছে। এস্তেগফার গাফ্‌র শব্দ হইতে উদ্ভূত। উহার অর্থ ঢাকিয়া দেওয়া এবং গাড়িয়া দেওয়া। এমতে এস্তেগফারের উদ্দেশ্য হইল, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার প্রেমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাহার পাপ চাপিয়া দেন এবং মানবীয় দুর্বলতার মূল যাহাতে নগ্ন হইতে না দেন। পরন্তু ঐশী চাদরে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাকে স্বীয় পবিত্রতার আশিস দেন, অথবা কোন শিকড় পাপের দ্বারা নগ্ন হইলে উহা ঢাকিয়া দেন এবং নগ্নতার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা কল্যাণের উৎস এবং তাঁহার জ্যোতিঃ যাবতীয় অন্ধকার দূর করিবার জন্য সব সময় প্রস্তুত, এই জন্য পবিত্র জীবন লাভের ইহাই প্রকৃত পন্থা যে, আমরা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হইতে ভীত হইয়া সেই পবিত্র উৎসের প্রতি উভয় হস্ত প্রসারিত করি, যেন সেই উৎস প্রবল বেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসে এবং সমস্ত অপবিত্রতাকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার পথে মৃত্যুকে বরণ করিয়া স্বীয় অস্তিত্বকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করা অপেক্ষা আর কোন উত্তম কোরবানী নাই। এই কোরবানীর শিক্ষাই খোদা তা'লার আমাদিগকে দিয়াছেন। যথা তিনি বলিতেছেন:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ, "তোমরা প্রকৃত পুণ্য কখনও অর্জন করিতে পারিবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা যাবতীয় প্রিয় বস্তু খোদার পথে ব্যয় কর।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৩)

ইহাই পথ, যাহা কোরআন আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে এবং ঐশী সাক্ষ্যও উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, ইহাই সোজা পথ। বিবেকও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। অতএব, যে বিষয় বহু সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত, উহার মোকাবেলা সেই বস্তু কখনও করিতে পারে না, যাহার কোন সাক্ষী নাই। নাসারাতীয় যীশু কোরআনের শিক্ষানুযায়ীই অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। তদনুসারে যে ব্যক্তি, এই পবিত্র শিক্ষাকে স্বীয় পথ প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তিই যীশুর ন্যায় হইয়া যাইবে। এই শিক্ষা হাজার হাজার লোককে মসীহে রূপান্তরিত করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে মসীহ্ করিয়াছে।

আমরা একান্ত বিনয় ও ভদ্রতার সহিত পাদ্রী সাহেবগণের খেদমতে প্রশ্ন করিতেছি যে, এক নিরীহ দুর্বল মানুষকে খোদা মানিয়া তাঁহাদের কী

আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে? যদি তাঁহারা উন্নতি প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা উহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি। নতুবা, **হে হতভাগ্য সৃষ্ট বস্তুর উপাসকগণ!** আইস, আমাদের অগ্রগতি দর্শন কর এবং মুসলমান হইয়া যাও। ইহা কি ন্যায় নীতির কথা নহে যে, যাহার স্বীয় পবিত্র জীবন, পবিত্র ঐশী জ্ঞান ও পবিত্র প্রেমের বিষয়ে স্বর্গীয় সাক্ষ্য আছে, সে-ই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার মূলধন শুধু কেস্‌সা কাহিনী, সে হতভাগ্য মিথ্যাবাদী এবং ময়লা ভক্ষণকারী?

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ

যদি তৌহীদের প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করাই ইসলামের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেন ইসলামের প্রারম্ভে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা হইয়াছিল? তাহাদের ইলহামী কেতাবসমূহে তৌহীদ ছাড়া কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আজকাল কেন ইহুদী বা যাহারা তৌহীদ মানে, তাহাদের নাজাতের জন্য মুসলমান হওয়া জরুরী মনে করা হয়?

উত্তরঃ

জানা আবশ্যক, ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে ইহুদীগণ তৌরাতের শিক্ষা হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিল। যদিও ইহা সত্য যে, তাহাদের ধর্ম-পুস্তকগুলিতে সৃষ্টিকর্তার তৌহীদ ছিল, কিন্তু তাহারা এই তৌহীদ দ্বারা উপকৃত হইতেছিল না। যে মূল ও মহান উদ্দেশ্যে মানুষের সৃষ্টি ও ঐশী গ্রন্থগুলি নাযিল করা হইয়াছিল, তাহারা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রকৃত তৌহীদ হইল, খোদার অস্তিত্ব স্বীকার ও তঁহার একত্ব মানার পর সেই পূর্ণ সত্তা ও পরম দয়াময় খোদার আজ্ঞানুবর্তিতা ও সন্তুষ্টি অর্জনে নিমগ্ন থাকা এবং তাঁহার প্রেমে বিলীন হওয়া। প্রকৃতপক্ষে, আমলের দিক দিয়া এই তৌহীদ তাহাদের মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। খোদা তা'লার মহিমা ও প্রতাপ তাহাদের চিত্ত হইতে উঠিয়া গিয়াছিল। তাহারা শুধু মৌখিকভাবে 'খোদা', 'খোদা বলিত। তাহাদের হৃদয় জড় উপাসনা, পার্থিব স্বার্থ, প্রবঞ্চনা ও চালবাজিতে সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে দরবেশ ও রাহেবদের, তথা মঠবাসী সংসারত্যাগীদের পূজা চলিতেছিল। অতি লজ্জাজনক কাজ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল।

কপটতা বৃদ্ধি পইয়াছিল। ষড়যন্ত্র ও ধোকাবাজি অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা এবং হৃদয়ে সহস্র সহস্র প্রতিমা জমা করিবার নাম তৌহীদ নয়। বরং যে ব্যক্তি তাহার নিজ কাজ, ফন্দি, ধোকাবাজি বা চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে খোদার ন্যায় প্রাধান্য দেয় কিংবা কোন মানুষের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখে, যাহা খোদার ওপর দেওয়া উচিত, সে খোদা তা'লার নিকট পৌত্তলিক। প্রতিমা শুধু তাহাই নহে, যাহা স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল বা প্রস্তর প্রভৃতির দ্বারা নির্মাণ করা হয় এবং যাহার ওপর ভরসা করা হয়; বরং প্রত্যেক জিনিস বা কথা বা কাজ যাহাকে এরূপ গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাহা খোদা তা'লার হক্, উহা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে প্রতিমা। অবশ্য একথা সত্য, তৌরাতে সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতার ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু কোরআন শরীফ ইহার বিস্তৃত আলোচনা ভরা। সুতরাং, কোরআন শরীফ নাযিল করায় খোদা তা'লার ইহাও একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, পৌত্তলিকতা, যাহা যক্ষ্মা রোগের ন্যায় মানব চিত্তে আক্রমণ চালাইতেছিল, উহাকে দূর করা। সেই যুগে ইহুদীগণ এরূপভাবে পৌত্তলিকতায় মগ্ন হইয়াছিল যে, তৌরাত তাহাদিগকে বিরত করিতে পারিতেছিল না। কারণ তৌরাতে এই সূক্ষ্ম ও গভীর শিক্ষা ছিল না। এই ব্যাধি সকল ইহুদীর মধ্যে প্রসার লাভ করায়, তৌহীদের পবিত্র আদর্শ প্রকাশার্থে এক জীবন্ত সিদ্ধ পুরুষের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত তৌহীদ, যাহার স্বীকৃতি খোদা আমাদের নিকট চান এবং যে স্বীকৃতির সহিত নাজাতের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এই যে, খোদা তা'লাকে মূর্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, নিজাত্মা, প্রবৃত্তি, কিংবা আপন চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ফন্দিফিকির ইত্যাদি সকল প্রকার বস্তুর অংশীবাদিতা হইতে পবিত্র জ্ঞান করা। তাঁহার মোকাবেলায় কোন শক্তিশালী জ্ঞান না করা। কাহাকেও অন্নদাতা স্বীকার না করা, কাহাকেও সম্মানদাতা বা লাঞ্ছনাকারী ধারণা না করা এবং কাহাকেও সাহায্যকারী নির্ধারণ না করা। দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বীয় প্রেম একমাত্র তাহাকেই নিবেদন করা, এবাদতকে শুধু তাঁহারই জন্যই নির্দিষ্ট করা, ভক্তিভরে একমাত্র তাঁহারই নিকটে বিনয়াবনত হওয়া ও সকল আশা ভরসা একমাত্র তাঁহারই উপর স্থাপন করা এবং শুধু তাঁহাকেই ভয় করা। কোন তৌহীদ নিম্নলিখিত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য ছাড়া কামেল হইতে পারে না।

প্রথমতঃ সত্তা হিসাবে তৌহীদ। তাঁহার অস্তিত্বের সম্মুখে, যাহা কিছু আছে সবই না থাকার ন্যায় জ্ঞান করা এবং সমস্ত নশ্বর ও অসার মনে করা।

দ্বিতীয়তঃ গুণের দিক হইতে তৌহীদ। অর্থাৎ সৃষ্টি, পালন ও ত্রাণ ইত্যাদি ঐশী গুণ, স্রষ্টার সত্তা ছাড়া কাহারও মধ্যে আরোপ না করা এবং বাহ্যিকভাবে যাহারা কর্মকর্তা ও কল্যাণ সাধনকারী বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগকে তাঁহারই পরিচালনাধীন বলিয়া প্রত্যয় করা।

তৃতীয়তঃ প্রেম, নিষ্ঠা ও নির্মলতার দিক দিয়া তৌহীদ। অর্থাৎ উপসনার উপাচার– প্রেমাদিতে অন্যকে খোদা তা'লার শরীক না করা এবং তাঁহাতেই বিলীন হওয়া।

উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তৌহীদ, যাহার ওপর নাজাত নির্ভর করে, ইহুদীরা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহাদের কদাচার একথার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছিল যে, খোদার ওপর বিশ্বাসের দাবী তাহাদের ঠোঁটে ছিল, হৃদয়ে ছিল না। কোরআন শরীফে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া খোদা তা'লা বলিয়াছেন যে, তাহারা যদি তৌরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষা পালন করিত, তাহা হইলে স্বর্গীয় উপজীবিকাও তাহারা লাভ করিত এবং পার্থিব উপজীবিকাও পাইত। ঈমানদারের নিদর্শনাবলী, যথা– অলৌকিক ঘটনা, দোয়া কবুল হওয়া, দিব্যদর্শন এবং এলহাম তাহাদের মধ্যে পাওয়া যাইত। এগুলি স্বর্গীয় উপজীবিকা। তাহা ছাড়া পার্থিব উপজীবিকাও তাহারা লাভ করিত। কিন্তু এখন তাহারা স্বর্গীয় উপজীবিকা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত এবং পার্থিব জীবিকাও, সত্যাভিমুখী হইয়া নহে, সংসারাভিমুখী হইয়া লাভ করিতেছে। অতএব, উভয় জীবিকা হইতে তাহারা বঞ্চিত।

এখন ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন শরীফের শিক্ষার দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল যুদ্ধ মুসলমানগণের দিক হইতে কখনও আরম্ভ করা হয় নাই। এই যুদ্ধগুলি কখনও বলপূর্বক ধর্মে আনিবার জন্য করা হয় নাই। বরং ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণ নিজেরা মুসলমানকে কষ্ট দিয়া বা তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের সাহায্য করিয়া এই সকল যুদ্ধের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিল। যখন তাহাদের দিক হইতে যুদ্ধের কারণ সৃষ্টি করা হইল, তখন ঐশী ক্রোধ এই জাতিগুলিকে শাস্তি দিতে চাহিল এবং এই শাস্তির মধ্যেও আল্লাহ্ তা'লা আপন করুণায় এই সুযোগ রাখিলেন যে, ইসলামে যাহারা প্রবেশ করিবে বা জিযিয়া দিবে, তাহাদিগকে এই আযাব হইতে রক্ষা করা হইবে।

এই সুযোগও খোদার প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী ছিল। কারণ প্রত্যেক বিপদ,

যাহা আযাবরূপে অবতীর্ণ হয়, যেমন মহামারি বা দুর্ভিক্ষ, তাহাতে মানুষের বিবেক আপনা আপনিই দোয়া ও তওবা, উদ্বেগ ও সদকা খয়রাত দ্বারা ঐ আযাবকে টলাইবার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সর্বদা এইরূপই হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, পরম করুণাময় খোদা আযাব দূর করিবার জন্য নিজেই লোকের মনে এলহাম করেন। হযরত মূসা আলাইহেস সালামের দোয়া কত বার গৃহীত হইয়া বনী ইস্রায়ীলের উপর হইতে আযাব টলাইয়াছিল। বস্তুতঃ ইসলামের এই যুদ্ধসমূহ কঠিন প্রকৃতির বিরুদ্ধবাদীগণের জন্য আযাব ছিল। এই আযাবের মধ্যে কৃপারও এক পথ উন্মুক্ত ছিল। অতএব, ইহা মনে করা ভুল যে, ইসলাম তৌহীদ প্রচারের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। স্মরণ রাখিতে হইবে, যুদ্ধের বুনিয়াদ শুধু শাস্তি হিসাবে তখনই স্থাপিত হইয়াছিল, যখন অন্যান্য জাতিরা অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন প্রশ্ন এই যে, ইহুদীগণের মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? তাহারা পূর্ব হইতেই একেশ্বরবাদী ছিল। আমরা এইমাত্র ইহার উত্তর দিয়া আসিয়াছি। তৌহীদ ইহুদীদের হৃদয়ে কায়েম ছিল না, শুধু কেতাবে ছিল এবং তাহাও অপূর্ণভাবে। অতএব, তৌহীদের মধ্যেও প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে তৌহীদের প্রাণ-বস্তু সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নাজাত লাভ হইতে পারে না। ইহুদীগণ মৃতের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের হৃদয় পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল। নানা প্রকার অবাধ্যতার ফলে, তাদের মধ্য হইতে সেই জীবিত আত্মা বাহির হইয়া গিয়াছিল। খোদার প্রতি তাহাদের কোনই আকর্ষণ ছিল না। তদুপরি তাহাদের তৌরাতের অপূর্ণ শিক্ষার জন্য এবং উহাতে শাব্দিক ও অর্থগত হস্তক্ষেপের ফলে, তাহা পূর্ণ পথ প্রদর্শনের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। এজন্য, খোদা নির্মল বারিধারার ন্যায় জীবন্ত বাণী অবতীর্ণ করিলেন এবং এই জীবন্ত বাণীর দিকে তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, যেন তাহারা নানা প্রকার ধোকা ও ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার পাইয়া প্রকৃত মুক্তি লাভ করিতে পারে। সুতরাং কোরআন শরীফ নাযিল হওয়ার যে সকল প্রয়োজন ছিল, তন্মধ্যে মুর্দা প্রকৃতির ইহুদিগকে যিন্দা তৌহীদ শিক্ষা দেওয়া একটি; দ্বিতীয়তঃ তাহাদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাহাদিগকে সতর্ক করা; তৃতীয়তঃ তৌরাতে যে সকল বিষয় শুধু সংকেতে বর্ণিত হইয়াছিল, যথা পুনরুত্থান, আত্মার অমরত্ব, বেহেশ্‌ত ও দোযখ, ইহাদের বিস্তৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত করা।

এই কথা সত্য যে, তৌরাত কর্তৃক সত্যের বীজ বপন করা হয়। ইঞ্জিল দ্বারা

এই বীজ ভবিষ্যতের এক সংবাদ-দাতার ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং কোন ক্ষেত্রের সবুজ গাছ যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য লইয়া বাহির হয় এবং অবস্থা দ্বারা সুসংবাদ প্রদান করে যে, অচিরেই উত্তম ফল ও ছড়া ধরবে, তেমনি ইঞ্জিল পূর্ণ শরয়িত ও পূর্ণ পথ প্রদর্শকের আগমনের জন্য সুসংবাদরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। ফুরকান দ্বারা সেই বীজ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ণ কল্যাণ সঙ্গে করিয়া আনিল, যাহা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্তভাবে প্রভেদ করিয়া দেখাইল এবং ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীকে চরমে পৌঁছাইল, যেমন তৌরাতে পূর্ব হইতে লিখিত ছিল:-

"সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, এবং পারাণ পর্বত হইতে আপন তেজ প্রকাশ করিলেন।"*

ইহা অকাট্য সত্য যে, শরীয়তের প্রত্যেক অঙ্গ পূর্ণরূপে শুধু কোরআন শরীফই প্রদর্শন করিয়াছে। শরীয়ত দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। (১) আল্লাহ্‌র হক্ এবং (২) বান্দার হক্। এই উভয় অংশকে কেবল মাত্র কোরআন শরীফই পূর্ণ করিয়াছে। কোরআনের সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল পশুতুল্য মানুষকে মানুষ করা, মানুষকে নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষ করা এবং নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষকে খোদা-যুক্ত আধ্যাত্মিক মানুষে পরিণত করা। বস্তুতঃ এই মহাদায়িত্বকে কোরআন যেভাবে পূর্ণ করিয়াছে, উহার তুলনায় তৌরাত মূকবৎ।

কোরআনের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ইহাও একটি বিষয় ছিল যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যেসব মতভেদ ছিল, তাহা দূরীভূত করা। কোরআন শরীফ এই সমুদয় ঝগড়ার মীমাংসা করিয়াছে, যেমন কোরআন শরীফের–

يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ

আয়াতটি[৫] ঝগড়া মীমাংসার্থেই অবতীর্ণ হইয়াছে। কারণ ইহুদীরা মনে করিত যে, খ্রীষ্টানদের নবী ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন। তৌরাতের নির্দেশ অনুসারে

---

* ['দ্বিতীয় বিবরণ', ৩৩:২] অনুবাদক।

টীকা-৫: ["হে ঈসা! আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব এবং তোমাকে আমার দিকে উত্তোলন করিব।" (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)।] –অনুবাদক

তিনি অভিশপ্ত (লানতী) হইয়াছিলেন এবং তাঁহার উর্ধ্বগতি হয় নাই। ইহা তাঁহার মিথ্যাবাদী হওয়ার প্রমাণ। খ্রীষ্টানেরা মনে করিত যে, তিনি অভিশপ্ত হইয়াছিলেন ঠিকই। কিন্তু তাঁহার অভিশপ্ত হওয়াটা ছিল মানুষের পাপ-মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য। কাজেই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার অভিশাপ অপসারিত হয়। তিনি উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হন ও খোদা তাঁহার দক্ষিণ হস্তের পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়া নেন। অতএব, এই আয়াত উপরোক্ত তর্কের মীমাংসা করিয়াছে যে, ঈসার মৃত্যুর পরে পরেই অবিলম্বে তাঁহার উর্ধ্বগতি হইয়াছিল। ইহা সত্য নয় যে, ইহুদীদের ভ্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী তিনি চির-অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা চিরতরে আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগমনের বিরোধী। পক্ষান্তরে, খ্রীষ্টানদের ভ্রান্ত ধারণা যে, ঈসা (আ.) কয়েকদিন অভিশপ্ত থাকিয়া পরে আল্লাহ্‌র দিকে তাঁহার ঊর্ধ্বগমন হইয়াছে, একথাও ঠিক নহে। সত্য ইহাই যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্‌র দিকে তাঁহার ঊর্ধ্বগমন হইয়াছিল। এই আয়াতগুলিতে খোদা তা'লা ইহাও বুঝাইয়াছেন যে, এই ঊর্ধ্বগমন তৌরাতের নির্দেশাবলীরও বিরোধী নয়। কারণ ঊর্ধ্বগতি না হওয়া ও 'লানৎ' তৌরাতের নির্দেশানুসারে শুধু তখন হয়, যখন কেহ ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে। ক্রুশ শুধু স্পর্শ করায় বা ক্রুশে মৃত্যুসম কষ্ট ভোগ করিলে, কেহ অভিশপ্ত হয় না এবং ইহাতে ঊর্ধ্বগতি ব্যাহত হয় না। কারণ তৌরাতে দেখা যায়, খোদা তা'লা মহাপাপীদের জন্য ক্রুশে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য যে ক্রুশে প্রাণত্যাগ করে, তাহার অপরাধীর মৃত্যু হয়। ইহা অভিশপ্ত মৃত্যু; কিন্তু খ্রীষ্ট ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে খোদা ক্রুশের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বরং তিনি যেমন বলিয়াছিলেন, আমার অবস্থা যোনার ন্যায় হইবে, তেমনি হইয়াছিল। যোনা[৬] মৎসের উদরে প্রাণত্যাগ করেন নাই। যীশুও ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই। তাহার প্রার্থনা, "এলী, এলী লেমা সাবাক্তানী"[৭] মঞ্জুর হইয়াছিল। তাহার ক্রুশে মৃত্যু হইলে, পীলাতের উপরও নিশ্চয়ই দৈব শাস্তি আসিত। কারণ স্বর্গীয় দূত পীলাতের

টীকা-৬: [অর্থাৎ ইউনুস নবী। 'মথি' ১২:৩৯-৪০ পদে লিখিত আছে: "এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোক চিহ্নের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীদের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহাদিগকে দেওয়া যাইবে না। কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মানুষ্যপুত্রও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন।"] –অনুবাদক

টীকা-৭: [অর্থাৎ, "ঈশ্বর আমার ঈশ্বর, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" ('মথি', ২৭ : ৪৬)] –অনুবাদক

স্ত্রীকে এই সংবাদ দিয়াছিলেন: "যীশুর মৃত্যু ঘটিলে স্মরণ রাখিবে, তোমাদের বিপদ ঘটিবে।" কিন্তু পীলাতের কোন বিপদ আসে নাই। যীশু জীবিত থাকার ইহাও একটি লক্ষণ যে, ক্রুশে তাঁহার হাড় ভাঙ্গা হয় নাই এবং ক্রুশ হইতে নামাইবার পর পার্শ্বদেশে অস্ত্র-বিদ্ধ করায় তাঁহার রক্তপাত হইয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগকে, ক্রুশের ঘটনার পর, তাঁহার জখমও দেখাইয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, নূতন জীবনের সঙ্গে ক্ষত থাকা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যীশু ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। এজন্য অভিশপ্ত হন নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তাঁহার পবিত্র মৃত্যু হইয়াছিল এবং খোদার রসূলগণের ন্যায় তিনিও খোদার দিকে উত্তোলিত হন। এই ঐশী প্রতিশ্রুতি إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ [৮] অনুযায়ী, খোদার দিকে তাঁর ঊর্ধ্বগতি হইয়াছিল। তিনি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিলে, তাঁহার নিজ কথা দ্বারাই তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতেন। কারণ ঐ অবস্থায় যোনা ভাববাদীর সহিত তাঁহার কোনই সামঞ্জস্য থাকিত না।

খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এই বিবাদ ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। কোরআন শরীফ ইহার মীমাংসা করিয়াছে। তবু এখন পর্যন্ত খ্রীষ্টানরা বলে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কি ছিল? কোরআন যুক্তি ও শাস্ত্রীয় লেখাকে একত্র করিয়া দেখাইয়াছে। কোরআন তৌহীদকে চরমে পৌঁছাইয়াছে। কোরআন তৌহীদ ও স্রষ্টার গুণাবলীর যুক্তি দিয়াছে এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ যুক্তি ও শাস্ত্র-বাক্য দ্বারা দিয়াছে। "কাশফ" (দিব্যদর্শন) দ্বারাও প্রমাণ দিয়াছে। ইতিপূর্বে ধর্ম কেস্‌সা কাহিনীর আকারে প্রচলিত ছিল। কোরআন ইহাকে বিজ্ঞানে রূপায়িত করিয়াছে। ধর্মের প্রত্যেকটি বিশ্বাসকে জ্ঞানের পোষাক পরাইয়াছে। ধর্মের অপূর্ণ সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলীকে পূর্ণতা দিতেছে। যীশুর স্কন্ধ হইতে অভিশাপের মালা অপসারিত করিয়াছে এবং তাহার ঊর্ধ্বগতি ও সত্য নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়াছে। এত সব কল্যাণ বিতরণ সত্ত্বেও কি কোরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইল না?

স্মরণ রাখিতে হইবে, কোরআন শরীফ স্বীয় প্রয়োজনীয়তার অত্যুজ্জ্বল প্রমাণ দিয়াছে। কোরআন শরীফে পরিষ্কার বলা হইয়াছে:

টীকা-৮: অর্থাৎ, আমি তোমাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব ও আমার দিকে উঠাইব'। (সূরা আলে ইমরান: ৫৬)

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

অর্থাৎ- "একথা জানিয়া রাখ যে, পৃথিবী মরিয়া গিয়াছে, এখন খোদা নূতনভাবে ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছেন।" (সূরা আল্ হাদীদঃ ১৮) ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোরআন শরীফ অবতীর্ণ হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে সব জাতিরই রীতি নীতি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। 'মিযানুল হক' প্রণেতা পাদ্রী ফণ্ডেল, যাঁহার শিরায় শিরায় বিদ্বেষ রহিয়াছে, তিনিও স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন, "কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ অনাচারী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইতেছিল। কোরআনের আগমন তাহাদের জন্য একটি সতর্কবাণী ছিল।" কিন্তু এই নির্বোধ যদিও স্বীকার করিল যে, কোরআন ঐ সময়ে আসিয়াছিল, যখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতি নীতি যারপর নাই খারাপ হইয়া পড়িতেছিল, তবু সে সেই মিথ্যা ওজর উপস্থিত করিল যে, এক মিথ্যা নবী পাঠাইয়া ইহুদী খ্রীষ্টানদিগকে সতর্ক করা আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু ইহা আল্লাহ্ তা'লার ওপর অপবাদ। আমরা কি মহিমান্বিত আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর প্রতি এইরূপ কদাচার আরোপ করিতে পারি যে, তিনি মানুষকে পথভ্রষ্ট ও অনাচারী দেখিয়া, তাহাদিগের জন্য আরও বিপথগামী হওয়ার উপকরণ সৃষ্টি করিলেন ও কোটি কোটি খোদার সৃষ্টিকে স্বহস্তে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিলেন? কঠিন বিপদাপদের সময় কি খোদা তা'লার প্রাকৃতিক বিধানে তাঁহার এই রীতিই প্রমাণিত হয়? দুঃখের বিষয় তাহারা পার্থিব প্রেমের মোহে কিরূপে সূর্যের দিকে থু থু নিক্ষেপ করিতেছে। একজন সামান্য মানুষকে খোদাও বলে, আবার অভিশপ্ত বলে এবং সেই মহানবীকে অস্বীকার করে, যিনি এমন সময় আসিয়াছিলেন, যখন মানবজাতি মৃতবৎ হইয়া পড়িতেছিল। তাহারা আরও বলে যে, কোরআনের প্রয়োজন কি ছিল? হে গাফেল অন্ধগণ! কোরআন যেরূপ অধার্মিকতার তুফানের যুগে আসিয়াছিল, কোন নবী তদ্রূপ যুগে আসেন নাই। ইহা পৃথিবীকে অন্ধ পাইয়া আলোক দান করিয়াছিল, পথভ্রষ্ট পাইয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছিল এবং মৃত পাইয়া প্রাণ দান করিয়াছিল। তবু কি ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণে কিছু বাকী রহিয়াছে? যদি বল, "তৌহীদ পূর্বেও ছিল, কোরআন নূতন কি জিনিস দিয়াছে?" তাহা হইলে তোমাদের এরূপ বুদ্ধির বহর দেখিয়া আরও বেশী কান্না আসে। আমি ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে, তৌহীদ

পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থগুলিতে পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিল না। তোমরা কখনও প্রমাণ করিতে পারিবে না যে, পূর্ণ আকারে ছিল। এতদ্ব্যতীত, তৌহীদ মানুষের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল। কোরআন এই তৌহীদকে আবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং ইহাকে চরমে পৌঁছাইয়াছে। এই জন্য কোরআন শরীফের এক নাম যিকর অর্থাৎ 'স্মারক'। একটু চক্ষু মেলিয়া চিন্তা কর, তৌহীদ সম্বন্ধে তৌরাতে যাহা কিছু বলিয়াছিল, তাহাতে এমন কি নূতন কথা ছিল, যাহা পূর্ববর্তী নবীগণ জানিতেন না। ইহা কি সত্য নয় যে, সর্বপ্রথমে আদম, তারপর শীষ, নূহ, ইব্রাহীম ও অন্যান্য রসূলগণ, যাঁহারা মূসার পূর্বে আগমন করেন, তৌহীদের শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? সুতরাং, তৌরাতের বিরুদ্ধেও এই আপত্তি উঠে যে, উহা নূতন কি জিনিস উপস্থিত করিয়াছিল? হে কুটিলচিত্ত জাতি! খোদা প্রত্যহ নূতন হইতে পারেন না। মূসার সময়েও সেই খোদাই ছিলেন, যিনি আদম, শীস, নূহ, ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফের সময় ছিলেন এবং তৌরাত সেই তৌহীদই বর্ণনা করিয়াছে, যাহা পূর্ববর্তী নবীগণ বর্ণনা করিয়া আসিতেছিলেন।

এখন যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তৌরাত কেন সেই পুরাতন তৌহীদ নিয়াই আলোচনা করিয়াছে, তবে ইহাই এ প্রশ্নের উত্তর যে, খোদার অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয় তৌরাত হইতে আরম্ভ হয় নাই, বরং আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য, কোন কোন যুগে ধর্ম-কর্ম ত্যাগের ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির দৃষ্টিতে উহা তুচ্ছ ও উপেক্ষনীয় হইয়া গিয়াছিল। অতএব, ঐশী গ্রন্থাবলী ও নবীগণের কাজ ইহাই ছিল যে, তাঁহারা এমন সময়ে আসিতেন, যখন তৌহীদের প্রতি মানুষের মনোযোগ একান্ত নগণ্য হইয়া যাইত এবং নানা প্রকার শিরকের মধ্যে নিপতিত হইত। পৃথিবীতে এই বিষয়ের সহস্র সহস্র বার শোধন হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র বার ইহাতে মরিচা পড়িয়া, ইহা লোক চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। তৌহীদ যখনই অদৃশ্য হইয়াছে, তখনই খোদা আবার তাঁহার কোন বান্দাকে পাঠাইয়াছেন, যাহাতে নূতনভাবে উহাকে উজ্জ্বলাকারে প্রদর্শন করেন। পৃথিবীতে এইভাবে কখনও আঁধার এবং কখনও আলোক পর্যায়ক্রমে অধিকার বিস্তার করিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক নবীর পরিচয়ার্থে ইহা অত্যুৎকৃষ্ট কষ্টি পাথর যে, তিনি কখন আসিয়াছেন এবং কতখানি সংস্কার তাঁহার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। সত্যান্বেষীগণের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া একথা চিন্তা করা উচিত। দৃষ্ট ও বিদ্বেষী ব্যক্তিদের অন্যায় হস্তক্ষেপমূলক

বাক্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিতে নাই। পরিষ্কার দৃষ্টি লইয়া কোন নবীর অবস্থা দেখুন, তিনি আবির্ভূত হইয়া সমসাময়িক জনগণকে কেমন অবস্থায় পাইয়া, তাহাদের বিশ্বাস ও রীতি-নীতিতে কি প্রকার পরিবর্তন করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইবে যে, কোন্ নবী সর্বাধিক প্রয়োজনের সময় আসিয়াছিলেন এবং কে তদপেক্ষা নিম্নতর প্রয়োজনকালে আগমন করেন? পাপীদের জন্য নবীর প্রয়োজন অবিকল তেমনি, যেমন রোগীর জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন। রোগীদের সংখ্যাধিক্যে যেমন চিকিৎসকের প্রয়োজন, পাপীদের সংখ্যাধিক্যে তেমনি সংস্কারের প্রয়োজন।

এখন যদি কেহ এই নিয়মকে মনে রাখিয়া, আরবের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যে, আরবের অধিবাসীগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে কিরূপ ছিল এবং পরে কিরূপ হইয়াছিল, তবে সে নিঃসন্দেহে শেষ যুগের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্রকরণ ক্ষমতা, তেজময় প্রভাব এবং সম্প্রসারণশীল কল্যাণময়তাকে, সকল নবীর তুলনায় শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বুঝিতে পারিবে এবং এই ভিত্তি-মূলেই সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং কোরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য সকল গ্রন্থ ও নবীদের প্রয়োজনীয়তা হইতে অধিক দেদীপ্যমান বলিয়া প্রত্যয় করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যীশু পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীর কোন্ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছিলেন? তিনি যে কোন্ প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছিলেন উহার প্রমাণ কোথায়? ইহুদীদের চরিত্র, অভ্যাস ও ঈমানে তিনি কোন বড় রকমের পরিবর্তন আনিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণ নাই বলিলেই চলে। অথবা তাঁহার শিষ্যদের আত্মিক পবিত্রতার পরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল। তাঁহার কার্যাবলী দ্বারা মানুষের পবিত্র সংস্কার সাধন সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নাই। যদি কোন প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তবে ইহাই যে, লোভ লালসায় ভরা কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সাথী হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেয়। যীশু যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তবে আমি ইহার অধিক কিছুই স্বীকার করিব না যে, এমন এক নির্বুদ্ধিতার কার্য তাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছে, মানবতা ও যুক্তি তাহাতে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইয়াছে। যে কার্য মানুষের তৈরী আইনও সর্বদা অপরাধ বলিয়া গণ্য করে, কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি তাহা করিতে পারে? কখনও না। অতএব, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যীশু কি শিখাইয়াছিলেন

এবং কি দিয়া গিয়াছিলেন? কি সেই অভিশপ্ত কোরবানী, যাহার ফল বুদ্ধি ও বিচারের আলোতে কিছুই প্রমাণিত হয় না?

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইঞ্জিলের শিক্ষায় নূতন কোন বৈশিষ্ট্য নাই। বরং ইহার সব শিক্ষাই তৌরাতে পাওয়া যায় এবং ইহার এক বৃহৎ অংশ ইহুদীদের 'তালমূদ' কেতাবে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান। ইহুদী পণ্ডিতেরা এখনও চিৎকার করেন যে, তাঁহাদের পুস্তকগুলি হইতে ঐ সকল কথা চুরি করা হইয়াছিল। ইদানিং এক ইহুদী পণ্ডিতের কেতাব আমি পাইয়াছি। তিনি একথা প্রমাণ করিবার জন্য কয়েক পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন এবং অত্যন্ত জোর দিয়া সনদ উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছেন কোথা হইতে ঐ সকল বাক্য চুরি করা হইয়াছে। আমি এই কেতাব শুধু মিয়াঁ সিরাজ উদ্দীনের জন্য আনাইয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা দেখিবার পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টান বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিল ইহুদী গ্রন্থের ঐ সকল বিষয়ের সার মর্ম, যাহা খ্রীষ্ট পসন্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অবশেষে বলেন যে, খ্রীষ্টের পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য কোন নূতন শিক্ষাদান ছিল না, বরং নিজ দেহকে কোরবানী করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, সেই অভিশপ্ত কোরবানী, যাহার বারংবার উল্লেখ হইতে আমি এই পুস্তিকাকে পবিত্র রাখিতে চাই। বস্তুতঃ খ্রীষ্টানেরা এই ভ্রমে পড়িয়াছে যে, শরীয়ত তৌরাত পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে বলিয়া যীশু কোন বিধানসহ আসেন নাই, বরং নাজাত দেওয়ার উপকরণ লইয়া আগমন করেন। এমতাবস্থায় কোরআন অযথা পুনঃ এমন এক শরীয়তের বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছে, যাহা ইতিপূর্বে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই ধোকা খ্রীষ্টানদের ঈমানকে খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কথা আদৌ সত্য নহে। আসল কথা হইল, মানুষ ভুলপ্রবণ। খোদার আদেশাবলী পালনে মানব জাতি সর্বদা কায়েম থাকিতে পারে না। এইজন্য সর্বদা নূতন স্মরণকারী ও শক্তিদাতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু কোরআন শরীফ শুধু এই দুই প্রয়োজনের কারণেই অবতীর্ণ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, ইহা পূববর্তী শিক্ষাসমূহের পরিপূরক ও অপূর্ণতার পূর্ণতা সাধনকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তৌরাতে যুগের অবস্থা অনুসারে প্রতিশোধ গ্রহণের ওপর জোর দেয় এবং ইঞ্জিল উহার যুগে অবস্থানুসারে ক্ষমা, ধৈর্য ও অপরাধ উপেক্ষা করার উপর জোর দেয়। কোরআন উভয় অবস্থাতেই পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবেক সম্মত বিচারের শিক্ষা দেয়। তৌরাতে প্রত্যেক ব্যাপারে কঠোরতার দিকে গিয়াছে

এবং ইঞ্জিল কোমলতার দিকে গিয়াছে। কোরআন শরীফ মধ্যপন্থা শিক্ষা দেয়, ক্ষেত্র ও ঘটনা দেখিয়া বিচার করিতে বলে। শিক্ষার বিষয়বস্তু যেখানে এক, সেখানেও তৌরাত বিষয়টির এক দিকে বেশী জোর দিয়াছে এবং ইঞ্জিল অপর দিকে বেশী জোর দিয়াছে; কিন্তু কোরআন শরীফ মানুষের প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মধ্য-পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। বিচার্য বিষয়ে, ক্ষেত্র ও অবস্থার প্রতি নজর রাখাই জ্ঞানের কাজ। এই জ্ঞানের শিক্ষা শুধু কোরআন শরীফই দিয়াছে। তৌরাত অনর্থক কঠোরতার দিকে আকর্ষণ করে* এবং ইঞ্জিল অমূলক ক্ষমার উপর জোর দেয়। কোরআন শরীফ সময়োপযোগী বিচারের তাগিদ করে। **সুতরাং মাতৃস্তনে পৌঁছিয়া রক্ত যেমন দুগ্ধে পরিণত হয়, সেইরূপ তৌরাত ও ইঞ্জিলের আদেশগুলি কোরআন শরীফে আসিয়া জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে।** কোরআন শরীফ না আসিলে তৌরাত এবং ইঞ্জিল অন্ধের তীর ছুঁড়ার ন্যায় হইত। কদাচিৎ এক আধটা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিত এবং শত শত বার ব্যর্থ হইত। বস্তুতঃ শরীয়ত গল্পাকারে তৌরাত কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ও উপমার রঙে ইঞ্জিল হইতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং জ্ঞানের ধারায় কোরআন হইতে সত্য আসিয়াছে এবং সত্যান্বেষীগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

অতএব, তৌরাত ও ইঞ্জিলের তুলনা কোরআনের সহিত কিভাবে হইতে পারে? এমন কি, কোরআন শরীফের কেবল প্রথম সূরার সহিত তুলনা করিতে চাহিলেও তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ সূরা ফাতেহা, সাতটি মাত্র আয়াতের এই সূরাটি যাহাকে সূরা ফাতেহা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা যেমনি সুগঠিত, সুললিত, সুসামঞ্জস্য ও সুসমন্বিত, তেমনি সুবিন্যস্ত ও হৃদয়গ্রাহী। ভাবের গভীরতা ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ এবং ভাষার লালিত্য ও মাধুরিমায় আপ্লুত এই সূরাতে সন্নিবেশিত রহিয়াছে শত শত সত্য, ধর্ম-তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাশি যাহা মূসার কেতাব বা যীশুর কয়েক পৃষ্ঠার ইঞ্জিল হইতে আজীবন চেষ্টা করিলেও পাওয়া যাইবে না। ইহা বৃথা বাগাড়ম্বর নহে, বরং পরম সত্য কথা। প্রকৃত কথা ইহাই যে, যুক্তি ও তথ্যে ভরা জ্ঞানের পরিসরে সূরা ফাতেহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সাধ্য তৌরাত ও ইঞ্জিলের নাই। আমরা কি করিতে পারি এবং ফয়সালা কিরূপে হইতে পারে? পাদ্রী সাহেবগণ

* এই কঠোরতা ও নম্রতা, যুগ ও জাতির অবস্থার দিক দিয়া উপযোগী শিক্ষা ছিল। কিন্তু ইহা মৌলিক ও চিরন্তন শিক্ষা ছিল না।

আমাদের কোন কথাই মানেন না। সত্যিই যদি তাঁহারা তাঁহাদের তৌরাত ও ইঞ্জিলকে সূক্ষ্মতত্ত্ব ও সত্যসমূহের বর্ণনায় এবং ঐশী-বাণীর গুণাবলী প্রকাশ বিষয়ে কামেল বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমরা পুরস্কার বাবদ ৫০০ পাঁচ শত টাকা তাঁহাদিগকে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। যদি তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র বিপুলায়তন প্রায় ৭০ খানা পুস্তক হইতে শরীয়তের ঐ সকল তত্ত্ব ও সত্য, সমন্বয় ও শৃঙ্খল-যুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানরত্ন ও ঐশীবাণীর বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারেন, যাহা সূরা ফাতেহা হইতে আমরা পেশ করিব, তাহা হইলে উক্ত টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। এই টাকা অল্প হইয়া থাকিলে আমাদের পক্ষে যত বেশী সম্ভবপর হয়, আমরা তাঁহাদের আবেদন পাইয়া, বৃদ্ধি করিব। আমরা পরিষ্কার ফয়সালা করিবার জন্য, প্রথমে সূরা ফাতেহার এক তফসীর তৈরী করিয়া ছাপিয়া উপস্থিত করিব। উহাতে সূরা ফাতেহায় নিহিত সব সত্য, তত্ত্ব ও ঐশী-বাণীর গুণ বিস্তারিত বর্ণনা করিব। পাদ্রী সাহেবদের কর্তব্য হইবে তৌরাত, ইঞ্জিল ও তাঁহাদের সমস্ত কেতাবগুলি হইতে সূরা ফাতেহার মোকাবেলায় সত্য, সূক্ষ্মতত্ত্ব ও ঐশী বাক্যে বিশেষত্ব অর্থাৎ অলৌকিক আশ্চর্য ঘটনাবলী যাহা মানুষের বাক্যে পাওয়া সম্ভবপর নয়, উপস্থিত করিয়া দেখানো। যদি তাঁহারা এই প্রকার প্রতিযোগিতা করেন এবং ভিন্ন জাতীয় ন্যায়পরায়ণ তিন ব্যক্তি বলেন যে, সূরা ফাতেহায় যে সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব, ঐশী বাণীর গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের দ্বারা উপস্থিত বিবরণেও প্রমাণিত হইয়াছে, তবে পাঁচশত টাকা, যাহা পূর্ব হইতে তাঁহাদের জন্য তাঁহাদের মনোনীত স্থানে জমা রাখা হইবে, আমরা তাহাদিগকে দিব।

এখন, কোন পাদ্রীর এই প্রকার প্রতিযোগিতা করিবার সাহস আছে কি? খোদার বাণী খোদার শক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়, যেমন তাঁহার সৃষ্টি কৌশল প্রাকৃতিক বিস্ময়কর লীলা দ্বারা প্রমাণিত হয়। যথা, আকাশে সহস্র তারকা ও নক্ষত্র বিরাজমান। যদি কোন নির্বোধ কতগুলি তারকার প্রতি সংকেত করিয়া বলে যে, এগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, তাই ইহারা খোদা তা'লার তরফ হইতে নয়, কিংবা কতিপয় বৃক্ষ, লতা, পাথর বা জন্তুর নাম লইয়া বলে যে, উহাদের অস্তিত্ব ছাড়াও অন্য বৃক্ষ লতাদি দ্বারা কাজ চলিতে পারে, এজন্য ঐগুলি খোদা তা'লার তরফ হইতে নয়; তবে তাহাকে পাগল বা বোকা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

একথা, স্মরণ রাখিবার উপযোগী যে, কোরআন মানুষের পূর্ণ আধ্যাত্মিক

উন্নতির জন্য, প্রয়োজনীয় যাবতীয় পূর্ণ গুণমালার আকর। কোরআনের সহিত তৌরাতের তুলনা এখন এক মুসাফিরখানার ন্যায়, যাহা অনেকগুলি ভীষণ বাত্যা ও ভূমিকম্পের ফলে ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং মুসাফিরখানার পরিবর্তে একটি ইঁটের স্তুপে পরিণত হইয়াছে। পায়খানার ইঁট পাকশালায় এবং পাকশালার ইঁট পায়খানায় গিয়া পড়িয়াছে এবং সমস্ত গৃহখানি উলট পালট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মুসাফিরদের অবস্থা দেখিয়া মুসাফিরখানার মালিকের দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার পরিবর্তে এমন একটি উত্তম ও আরামপ্রদ মুসাফিরখানা নির্মাণ করিলেন, যাহা পূর্বাপেক্ষা ভাল এবং মুসাফিরদের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক। কামরাগুলি প্রয়োজনানুযায়ী সজ্জিত এবং কোন প্রয়োজনের জন্য স্থানাভাব নাই। মালিক শেষোক্ত মুসাফিরখানা নির্মাণে কিছু ইঁট পূর্ববর্তী মুসাফিরখানা হইতে গ্রহণ করিলেন। তদোতিরিক্ত আরো অনেক ইঁট ও কাঠ ইত্যাদি উপকরণ সরবরাহ করিলেন, যাহাতে বাড়ীটি সর্বতোভাবে যথেষ্ট হয়। বস্তুতঃ কোরআন শরীফ এই শেষোক্ত মুসাফিরখানা। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখুন।

এখানে আরও একটি আপত্তি খণ্ডন প্রয়োজন। যখন খাঁটি ও পূর্ণ শিক্ষার ইহাই পরিচয় যে, উহাতে স্থান ও কালের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিষদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তখন কি কারণে তৌরাত ও ইঞ্জিলে ইহা করা হয় নাই এবং কোরআন শরীফ কেন এগুলিকে পূর্ণতা দিল? ইহার উত্তর এই যে, তৌরাত ও ইঞ্জিলের দোষ নাই। ত্রুটি জাতিগণের যোগ্যতায়। ইহুদী, যাহাদের সহিত হযরত মূসা (আ.)-এর পালা পড়িয়াছিল, তাহারা চারিশত বৎসর পর্যন্ত ফেরাওনের দাসত্বে আবদ্ধ ছিল এবং দীর্ঘকালব্যাপী নিপীড়িত ও নির্যাতিত হইতে হইতে ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারের প্রকৃত তত্ত্ব হইতে বে-খবর হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা একটি স্বাভাবিক নিয়ম যে, যুগের বাদশাহ, যিনি রাজ্যের মধ্যে আদর্শ গুরুস্থানীয় হইয়া থাকেন, তিনি সুবিচারক হইলে, প্রজাদের মনেও ন্যায়পরায়ণতার আলোকপাত হয় এবং তাহারাও স্বাভাবিকভাবে ন্যায়পরায়ণতার গুণের দিকে আকৃষ্ট হয়। সৌজন্য ও শিষ্টতা তাহাদের মধ্যে উদ্‌গত হইয়া ন্যায়পরায়ণতাসূচক গুণগুলি আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু বাদশাহ অত্যাচারী হইলে, প্রজাগণও তাঁহার নিকট হইতে অত্যাচার ও অবিচারের শিক্ষা গ্রহণ করে। তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ন্যায়পরায়ণতা বিবর্জিত হইয়া পড়ে। বনী ইস্রাঈলগণেরও এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। তাহারা

দীর্ঘ সময় ব্যাপী ফেরাওনের ন্যায় অত্যাচারী বাদশাহের প্রজা থাকায় এবং নানা প্রকার নিপীড়ন ভোগ করিবার ফলে, ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য সর্বপ্রথম তাহাদিগকে ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেওয়া হযরত মূসা (আ.)-এর কর্তব্য ছিল। তাই তৌরাতে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষার্থে কঠোরতাপূর্ণ বাক্যাবলী পাওয়া যায়। অবশ্য, দয়া সংক্রান্ত বাক্যাবলীরও সন্ধান তৌরাতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এই প্রকার বাক্যাবলীও ন্যায়পরায়ণতার সীমা রক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য এবং অবৈধ উত্তেজনা ও অন্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণতা রোধ করিবার জন্য বর্ণিত হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারমূলক বিধানাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু ইঞ্জিল পাঠে এই উদ্দেশ্য জানা যায় না। ইঞ্জিলে রক্ষা ও প্রতিশোধ-ত্যাগের ওপর অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। আমরা গভীর দৃষ্টি সহ ইঞ্জিলের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার বিবরণে পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, এই পুস্তক প্রণেতা তাঁহার সম্মুখস্থ ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তাহারা দয়া, দাক্ষিণ্য ও ধৈর্য হইতে ও প্রতিশোধ-ত্যাগ হইতে সম্পূর্ণ দূরে ছিল এবং তিনি চাহিতেছিলেন যেন, তাহাদের হৃদয় এমন হইয়া যায় যে, প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু না হইয়া ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও পরের অন্যায় উপেক্ষা করিবার মত অভ্যাস তাহাদের মধ্যে গড়িয়া উঠে। ইহার কারণ হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের সময় ইহুদীগণের চারিত্রিক অবস্থার অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছিল। তাহারা বিবাদ বিসম্বাদ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল। ন্যায়পরায়ণতার বাহানায় তাহারা দয়া ও ক্ষমার স্বভাবকে অন্তর হইতে একেবারে বিদুরীত করিয়া দিয়াছিল। এজন্য ইঞ্জিলের বিধান যুগ বা জাতি বিশেষের জন্য সাময়িক ব্যবস্থারূপে তাহাদিগকে শোনান হইল। কিন্তু ইহা স্থায়ী ও আসল ব্যবস্থার চিত্র ছিল না। এজন্য কোরআন আসিয়া ইহাকে অপসারিত করিল।

কোরআন শরীফের প্রতি অভিনিবেশসহ দৃষ্টিপাত করিলে এবং পরিষ্কার মন লইয়া ইহার উদ্দেশ্যের গভীরতার মধ্যে ডুব দিলে, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, কোরআন তৌরাতের ন্যায় প্রতিশোধ ও কঠোরতার উপর জোর দেয় নাই, যেমন তৌরাতের যুদ্ধাবলী ও প্রতিশোধমূলক নিয়মাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং ইঞ্জিলের ন্যায় ক্ষমা, ধৈর্য ও দোষ না ধরার শিক্ষার প্রতি একেবারে ঝুঁকিয়া পড়ে নাই। বরং বারবার ভাল বিষয়ের আদেশ দেয় এবং অন্যায়

সম্বন্ধে নিষেধ করে। অর্থাৎ, এই আদেশ দেয় যে, বুদ্ধি ও বিধানের দিক দিয়া যাহা ভাল এবং অবস্থা ও সময়ের উপযোগী, তাহা পালন করিবে এবং বুদ্ধি ও বিধানের দিক হইতে যে বিষয়ে আপত্তি উঠে, যাহা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের অন্তর্গত, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। অতএব কোরআন শরীফে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ইহা যুক্তির দ্বারা আমাদের হৃদয়ে ইহার আইন কানুন, বিধিনিষেধ ও আদেশগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ব্যক্তিগত বিধিনিষেধের কারাগারে উহা আমাদিগকে বন্দী করিতে চাহে না। পরন্তু নিজ পবিত্র শরীয়তকে সার্বভৌমিক মৌলিক নীতি রূপে বর্ণনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উহার একটি মৌলিক আদেশ এই যে, সৎকাজে তোমরা ব্রতী হও এবং অসৎ কাজ হইতে বিরত হও। সুতরাং, এই দুইটি কথা (১) সৎ ও (২) অসৎ এমন ব্যাপক শব্দ, যাহা শরীয়তের নিয়মকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে আমাদিগকে প্রতিক্ষেত্রে ভাবিতে হয় যে, প্রকৃত পুণ্য কি? দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন ব্যক্তি আমাদের প্রতি অন্যায় করিলে, তাহাকে প্রহার করা ভাল, না ক্ষমা করা ভাল? কোন প্রার্থী আমাদের নিকট হাজার টাকা এই উদ্দেশ্যে চাহিল যে, সে এই টাকা দিয়া ধুমধামের সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দিবে, বাজি পোড়াইবে, গায়িকা ও বাদ্যাদি সহ তাহার পারিবারিক প্রথাগুলি পালন করিবে, তখন আমরা হাজার টাকা তাহাকে দিতে পারিলেও সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মের প্রতিরোধের নীতি অনুযায়ী আমাদের ভাবিতে হইবে যে, এই প্রকার বদান্যতা আমরা কাহার সাহায্যার্থে করিতেছি? বস্তুতঃ এই প্রকারেই কোরআন শরীফ আমাদের ধর্ম ও সাংসারিক মঙ্গলার্থে আমাদের প্রত্যেক ভাল কাজে ক্ষেত্র ও অবস্থার বাঁধন সংযোজিত করিয়া দিয়াছে।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমি মিয়াঁ সিরাজ উদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়া আসিতেছি। আমি লিখিয়াছি যে, ইসলাম তৌহীদ স্বীকার করাইবার জন্য ইহুদীদের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ করে নাই বরং ইসলামের বিরুদ্ধবাদীগণ নিজেরা নানা উপদ্রব দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহের কারণ ঘটাইয়াছিল। কেহ কেহ মুসলমানদিগকে হত্যা করিবার জন্য প্রথমে অস্ত্র ধারণ করে এবং কেহ কেহ তাহাদিগকে সাহায্য করে, আবার কেহ কেহ ইসলামের প্রচার রোধ করিবার জন্য অন্যায় চাপ দিতে থাকে। অতএব, এই সকল কারণে বিদ্রোহীদের দমন, দণ্ড বিধান ও অন্যায়ের প্রতিরোধার্থে খোদা তা'লা এই সকল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। আর শত্রুদের পক্ষে এই কথা বলা যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এজন্য যুদ্ধ করেন নাই যে, তখন পর্যন্ত পুরাপুরি তাহার দল গঠিত হয় নাই, ইহা শুধু অন্যায়, অমূলক ও বিভ্রান্তিকর ধারণা মাত্র। যদিওবা এরূপ হইত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধবাদীগণ ১৩ বৎসর পর্যন্ত ঐ সকল অত্যাচার ও রক্তপাত হইতে নিবৃত্ত থকিত, যাহা মক্কায় তাহারা করিয়াছিল এবং ষড়যন্ত্রপূর্বক তাহারা যদি নিজেরাই এই প্রস্তাব গ্রহণ না করিত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করিতে হইবে বা দেশত্যাগী করিতে হইবে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শত্রুদের আক্রমণ ছাড়া নিজে নিজেই মদীনার দিকে গমন করিতেন, তবে এই প্রকার কুধারণা করার কারণ থাকিত।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণও জানে যে, তের বৎসর যাবৎ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সর্ব প্রকার কঠোরতায় স্বয়ং ধৈর্য ধারণ করেন এবং সাহাবাগণের উপর কড়া তাগিদ দেন যেন তাঁহারা অন্যায়ের মোকাবেলা না করিয়া ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। বিরুদ্ধাচারীগণ অনেক হত্যাকাণ্ড করে এবং মুসলমানদিগকে তাহারা যে রকম মারধর এবং গুরুতর জখম করে, তাহার কোন হিসাব ছিল না। অবশেষে উহারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করে। এইরূপ সময়ে খোদা তাঁহার নবীকে শত্রুদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া মদীনায় পৌঁছাইয়া দেন এবং সুসংবাদ দেন যে, যাহারা তরবারি ধরিয়াছে, তাহারা তরবারি দ্বারাই ধ্বংস হইবে। সুতরাং, একটু বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতা লইয়া চিন্তা করুন যে, এই ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যখন কিছু দলবল হইল, তখন তাঁহার মনে পূর্ব হইতে সঞ্চিত যুদ্ধের সংকল্প প্রকাশিত হইয়া পড়িল? পরিতাপ! শত পরিতাপ!! খ্রীষ্ট ধর্ম সমর্থকগণের ধর্ম-বিদ্বেষ কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে? তাহারা ইহাও চিন্তা করে নাই যে, মদীনায় যাওয়ার পর মক্কাবাসীদের পশ্চাদ্ধাবনের ফলে যখন বদরের যুদ্ধ হইল, যাহা ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, তখন কোন দলবলের সৃষ্টি হইয়াছিল কি? তখন সর্বমোট ৩১৩ জন মুসলমান ছিলেন, যাঁহারা বদর রণাঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বালক এবং অনভিজ্ঞ ছিলেন। অতএব, ভাবিবার কথা,

ঈদৃশ মুষ্টিমেয় লোকের উপর নির্ভর করিয়া আরবের সকল বীর, ইহুদী ও খ্রীষ্টান এবং লক্ষ লক্ষ জনগণকে দমন করার উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে কাহারও সুস্থ বুদ্ধি কি কখনও পরামর্শ দিবে? ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, উল্লিখিত অভিযান সেই সকল ব্যবস্থা ও সংকল্পের ফল নহে, যাহা দুশমনকে বিনাশ করিবার ও নিজের জয়ের জন্য কেহ চিন্তা করিয়া থাকে। কারণ এইরূপ হইলে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী একত্র করা জরুরী ছিল। ইহার পর আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের মোকাবেলা করা। এইসব হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই যুদ্ধ অনন্যোপায় অবস্থায় খোদা তা'লার আদেশে করা হইয়াছিল, বাহ্যিক উপকরণের ভরসায় নহে।

এস্থলে আরো এক আপত্তি খণ্ডন করা প্রয়োজন এবং তাহা এই যে, যদি তৌহীদ ও পুণ্যকর্ম, যাহা খোদার প্রেম ও ভয়ে সম্পাদিত হয়, তাহা মুক্তির উপায় হইয়া থাকে, তবে ইহুদীদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হইয়াছে কেন? ইহুদীদের মধ্যে কি এমন কেহই ছিল না যে, কার্যতঃ তৌহীদ পালন করিতে পারিত এবং খোদার আজ্ঞা শিরোধার্য করিত?

ইহার উত্তর এই যে, আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সময় অধিকাংশ ইহুদী ও খ্রীষ্টান খোদার আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী ও পাপাসক্ত ছিল, যেমন কোরআন শরীফ স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়:

وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ

সুতরাং, যখন তাহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই 'ফাসিক' (খোদার আদেশ লঙ্ঘনকারী ও পাপাসক্ত) ছিল, (সূরা আত্ তওবা: ৮) যাহারা কার্যতঃ তৌহীদের সম্মান করিত না এবং সৎকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লার দয়া, চিরাচরিত নিয়মানুসারে ইহাই তাগিদ করিল যেন তাহাদের সংশোধনের জন্য, তাহাদের নিকট রসূল পাঠান হয়। অতঃপর, যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, তাহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তৌহীদভক্ত ও সাধু ছিল। কিন্তু খোদার রসূলের বিরুদ্ধাচরণের ফলে, তাহারা আর সাধু রহিল না। যখন সামান্য পাপ মানুষের হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন কিরূপে ধারণা করা যায় যে, খোদার রসূলের আমান্যকারী ও তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী পবিত্রচিত্ত থাকিতে পারে?

তৃতীয় প্রশ্নঃ

মানুষ ও খোদার সম্বন্ধ স্থাপন করিবার বিষয়ে এবং মানুষের সহিত খোদা কিভাবে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে কোরআনে কি আয়াত আছে, যাহাতে বিশেষভাবে 'মহব্বত' বা 'হুব্বের' ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে?

উত্তরঃ

কোরআন শরীফের শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহাই যে, খোদা যেমন 'ওয়াহেদ ও লা-শরীক', এক-অদ্বিতীয় ও অংশীবিহীন, তেমনি স্বীয় প্রেমের দিক দিয়া মানব যেন তাঁহাকে 'ওয়াহেদ ও লা-শরীক' প্রতিপন্ন করে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা, যাহা সব সময় মুসলমান আবৃত্তি করিয়া থাকে, ইহার প্রতি সংকেত করে। কারণ 'ইলাহা' وَلَاهَ إِلٰه ধাতু হইতে উদ্ভূত। ইহার অর্থ এমন প্রাণ-বল্লভ ও প্রিয়, যাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। এই কলেমা তৌরাতও শিক্ষা দেয় নাই এবং ইঞ্জিলও দেয় নাই; শুধু কোরআন শরীফ ইহা শিক্ষা দিয়াছে। ইসলামের সহিত এই কলেমার এরূপ সম্বন্ধ যেন ইহা ইসলামের পদক স্বরূপ। এই কলেমাই পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদের মিনার হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়। খ্রীষ্টান ও হিন্দু তাহাতে চটে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রেমভরে খোদাকে স্মরণ করা তাহাদের নিকট পাপ। ইসলামেরই বিশেষত্ব যে, প্রভাত হওয়া মাত্র মুসলিম মুয়াজ্জিন উচ্চৈঃস্বরে বলে: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কেহ আমাদের প্রিয়, দয়িত ও উপাস্য নাই। তারপর দ্বিপ্রহরের পর এই ধ্বনিই ইসলামী মসজিদগুলি হইতে আসে। তারপর আসরের সময়েও এই ধ্বনি, আবার মাগরেবেও এই ধ্বনি, আবার এশাতেও এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া আকাশে আরোহণ করে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মে কি এ দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়?

অতঃপর ইসলাম শব্দের অর্থও 'প্রেম' নির্দেশ করে। কারণ খোদা তা'লার সম্মুখে মস্তক স্থাপন ও মনে প্রাণে কোরবানীর জন্য প্রস্তুত হওয়া, যাহা ইসলামের অর্থ, এরূপ এক আম্‌লী বা ব্যবহারিক অবস্থা, যাহা প্রেমের প্রস্রবণ হইতে নির্গত হয়। 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, কোরআন শরীফ শুধু মৌখিকভাবে প্রেমকে সীমাবদ্ধ করে নাই, বরং ব্যবহারিক ভাবেও প্রেম ও আত্মোৎসর্গের পন্থা শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে অন্য আর কোন ধর্ম আছে কি, যাহার প্রবর্তক উহার নাম ইসলাম রাখিয়াছেন? ইসলাম অত্যন্ত প্রিয় শব্দ।

সত্যপরায়ণতা, আন্তরিক নিষ্ঠা ও প্রেমের ভাবে এই শব্দ ভরপুর। সুতরাং ধন্য ঐ ধর্ম, যাহার নাম ইসলাম। সেইরূপ, খোদার প্রেম সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ, 'ঈমানদার তাহারা যাহাদের নিকট খোদা, সর্বাপেক্ষা প্রিয়'। (সূরা আল্ বাকারা: ১৬৬)

আর একস্থানে বলা হইয়াছে:

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا

অর্থাৎ 'খোদাকে সেইভাবে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা তোমাদের পিতাকে স্মরণ করিয়া থাক, বরং ততোধিক প্রেমের সহিত স্মরণ করিবে'। (সূরা আল্ বাকারা: ২০১)

আরও একস্থানে বলা হইয়াছে:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۶۳﴾

অর্থাৎ, "যাহারা তোমার অনুবর্তিতা করিতে চায়, তাহাদিগকে বল, আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার মরণ ও আমার জীবন সকলই আল্লাহ্ তা'লার জন্য যিনি বিশ্বচরাচরের প্রতিপালক। যে আমার অনুবর্তিতা করিতে চায়, তাহাকেও এইভাবে কোরবানী করিতে হইবে।" (সূরা আল্ আনআম: ১৬৩)

অন্য আর এক স্থানে বলা হইয়াছে:

"যদি তোমাদের প্রাণ, তোমাদের বন্ধু, তোমাদের বাগান ও ব্যবসাকে খোদা ও তাঁহার রসূল অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া মনে কর, তবে পৃথক হইয়া পড়, যে পর্যন্ত না খোদা তা'লা মীমাংসা করেন।"

এইভাবে আরো একস্থানে বলা হইয়াছে:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ﴿۹﴾
اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿۱۰﴾

অর্থাৎ, "তাঁহারাই মুমেন, যাহারা খোদার প্রেমে মিসকীন, এতীম ও বন্দীদিগকে আহার দেয় এবং বলে, 'আমরা শুধু খোদার প্রেমে ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে তোমাদিগকে দিই। আমরা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না এবং কৃতজ্ঞতা চাহি না।" (সূরা আদ্ দাহর: ৯-১০)

বস্তুতঃ কোরআন শরীফ এই প্রকার প্রেমপূর্ণ আয়াতে ভরা। সেখানে লিখিত আছে যে, তোমরা তোমাদের কথা ও কার্যের দ্বারা খোদার প্রেম প্রদর্শন কর এবং খোদাকে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেম কর। এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ হইতেছে, কোরআন শরীফে কোথায় লিখিত আছে যে, খোদাও মানুষকে প্রেম করেন? অবহিত হউন, কোরআন শরীফে এই প্রকার বহু আয়াত আছে যে, 'খোদা তওবাকারীদেরকে* ভালবাসেন,' 'খোদা সদাচারীদিগকে ভালবাসেন', এবং খোদা ধৈর্যাবলম্বীদিগকে প্রেম করেন'। অবশ্য কোরআন শরীফে ইহা কোথাও লিখিত নাই যে, যে ব্যক্তি কুফরী করে, অসদাচরণ ও অত্যাচার করে খোদা তাহাকে প্রেম করেন। এস্থলে তিনি 'অনুগ্রহ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন তিনি বলিতেছেন:

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ ۝

অর্থাৎ, "সমগ্র বিশ্বের প্রতি দয়া ও করুণা স্বরূপ আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি।" (সূরা আল্ আম্বিয়া: ১০৮) আলামীন (সমগ্র বিশ্ব) শব্দের মধ্যে কাফের (অবিশ্বাসী), বেঈমান (অসাধু), ফাসেক (খোদার সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী) ও ফাজের (পাপী) আছে এবং তাহাদের জন্য রহমতের দরজা এভাবে খোলা হইয়াছে যে, তাহারা কোরআন শরীফের নির্দেশ পালন করিয়া নাজাত লাভ করিতে পারে। আমি অবশ্য একথা স্বীকার করি যে, কোরআন শরীফে মানুষের প্রতি খোদার প্রেমের এমন কোন উল্লেখ নাই যে, তিনি তাঁহার কোন পুত্রকে পাপীদের পাপের পরিবর্তে ক্রুশে দিয়াছেন এবং তাহাদের অভিশাপ তাঁহার প্রিয় পুত্রের ওপর ন্যস্ত করিয়াছেন। খোদার পুত্রের ওপর লানৎ (নউযুবিল্লাহ) খোদার ওপরই লানৎ। কারণ পিতা ও পুত্র ভিন্ন নহেন। ইহা অতি সুস্পষ্ট যে, লানৎ ও ঈশ্বরত্ব একত্র হইতে পারে না। তারপর ইহাও

* খোদার প্রেম মানুষের প্রেমের ন্যায় নয়। মানুষের প্রেমে বিরহ দ্বারা ব্যথা ও কষ্টানুভব আছে। খোদার প্রেমের অর্থ তিনি পুণ্যচারীগণের প্রতি প্রেমিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।—গ্রন্থকার

ভাবিয়া দেখার বিষয় যে, খোদা দুনিয়ার সকল পাপীদের প্রতি এ কিরূপ প্রেম দেখাইলেন যে, সাধুকে বধ করিয়া দুষ্টকে প্রেম করিলেন। ইহা এমন এক আচরণ, যাহা কোন পুণ্যাত্মা অনুসরণ করিতে পারে না।

এই প্রশ্নের তৃতীয় অংশ হইল কোরআন শরীফে কোথায় ইহা লিখিত আছে যে, মানুষ মানুষকে প্রেম (মহব্বত) করিবে? ইহার উত্তর এই যে, কোরআনে এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমের (মহব্বতের) পরিবর্তে দয়া ও সহানুভূতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ প্রেম (মহব্বত) শব্দ প্রকৃতপক্ষে খোদার জন্য ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দ। মানবজাতির জন্য 'প্রেমের' পরিবর্তে খোদার কালামে দয়া (رحم) ও অনুগ্রহ (احسان) শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ পূর্ণ প্রেম (মহব্বত)* উপাসনা চায় এবং পূর্ণ দয়া সহানুভূতি চায়। এই প্রভেদটি অন্য জাতিরা বুঝিতে পারে নাই। তাহারা খোদার হক্ অন্যকে দিয়েছে। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, যীশুর মুখ হইতে এইরূপ শেরেকপূর্ণ শব্দ বাহির হইয়াছে। আমার ধারণা, পরে এই অনুচিত শব্দ ইঞ্জিলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার পর অযথা যীশুর দুর্নাম করা হইয়াছে। বস্তুতঃ খোদার পবিত্র বাণীতে মানব জাতির জন্য রহম বা দয়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেমন তিনি বলিয়াছেন:

تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

অর্থাৎ "তাহারাই মুমেন, যাহারা সত্য ও দয়ার উপদেশ দেয়।" (সূরা আল্ আসর: ৪ ও সূরা আল্ বালাদ: ১৮) অন্যত্র বলা হইয়াছে:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى

অর্থাৎ- "খোদার আদেশ এই যে, তোমরা জনসাধারণের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হও এবং ইহার উর্ধ্বে তোমরা দয়াপরবশ হও এবং ইহারও উর্ধ্বে তোমরা মানব জাতির প্রতি এরূপ সহানুভূতিশীল হও যেমন কোন নিকট আত্মীয়ের প্রতি নিকটাত্মীয় সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে।" (সূরা আন্ নাহল: ৯১)

এখন চিন্তা করা কর্তব্য যে, পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা আর কোন উচ্চতর শিক্ষা

---

* 'প্রেম' محبت শব্দ যেখানেই মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে প্রকৃত প্রেম বুঝায় না। বরং ইসলামী শিক্ষার দিক হইতে 'প্রকৃত প্রেম' শুধু খোদার জন্য প্রযোজ্য এবং অন্য যাবতীয় প্রেম অপ্রকৃত ও বাসনাজাত। -গ্রন্থকার

আছে কি, যাহার মধ্যে সমগ্র মানব জাতির সহিত সদাচারকে শুধু দয়াতেই সীমাবদ্ধ রাখে নাই এবং মনের সহজাত ভাবাবেগের মার্গ, যাহাকে **ইতায়ি যিল কুরবা** (অর্থাৎ আত্মীয়সুলভ আদান-প্রদান) বলা হয়, উহা ও উক্ত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারণ অনুগ্রহকারী যদিও অনুগ্রহের সময় একটা পুণ্য কর্ম করে, কিন্তু সে প্রতিফল ও প্রতিদানের আকাঙ্খা করে। এজন্য সে কখনও অনুগ্রহ অস্বীকারকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারে এবং কখনও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া তাহার অনুগ্রহও স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক প্রেরণায় পুণ্যাচার, যাহাকে কোরআন নিকট আত্মীয়ের প্রতি টানের সহিত তুলনা করিয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে শেষ সীমানার পুণ্য, যাহার পর পুণ্যের আর কোন মার্গ নাই। কারণ সন্তানের প্রতি মাতার সেবা ও করুণা একটা স্বাভাবিক বৃত্তি এবং অসহায় দুগ্ধ-পোষ্যের নিকট হইতে তাহার কোন প্রকার কৃতজ্ঞতার দাবী নাই।

মানবীয় অধিকার সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে এই তিনটি স্তর বর্ণিত হইয়াছে। তৌরাত এবং ইঞ্জিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ঈমানদারীর সহিত বলিতে বাধ্য হই যে, উক্ত দুইটি গ্রন্থ উচ্চাঙ্গের মানবীয় অধিকার সম্বন্ধে নীরব। এমতাবস্থায় উক্ত গ্রন্থ দুইটি হইতে আমরা উচ্চতর তৃতীয় স্তর সম্বন্ধে কি আশা করিব? কারণ উহাদের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের উল্লেখ পর্যন্ত পূর্ণভাবে করা হয় নাই। কারণ তৌরাত যেখানে কেবল ইহুদীগণের জন্য নাযিল হইয়াছিল এবং হযরত ঈসা (আ.)-ও কেবল বনী ইস্রায়েলের মেষগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেখানে অন্যের সহিত তাহাদিগের কি সম্বন্ধ ছিল যে, তাহাদের প্রতি বিচার عدل ও অনুগ্রহ احسان শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে? অতএব ঐ সকল আদেশাবলী বনী ইস্রায়েলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যদি সীমাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে হযরত ঈসা (আ.) জনৈকা স্ত্রীলোকের সকরুণ কান্নাকাটি এবং কাতর নিবেদন শুনিয়াও কিরূপে তিনি তাহার প্রতি দয়া পরবশ হইলেন না এবং উত্তর দিলেন, "আমি কেবল বনী ইস্রায়েলগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছি।" সুতরাং হযরত ঈসা (আ.) যখন স্বয়ং এক অ-বনী ইস্রায়েলের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির কোন নমুনা প্রদর্শন করিলেন না, তখন কীভাবে আশা করা যাইতে পারে যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর শিক্ষার মধ্যে বিজাতীয়ের জন্য দয়ার আদেশ আছে। হযরত ঈসা (আ.) পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি বিজাতীয়গণের জন্য প্রেরিত

হন নাই। এমতাবস্থায় আমরা কীভাবে আশা করিতে পারি যে, তাঁহার শিক্ষার মধ্যে বিজাতীয়গণের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রদর্শনের উপদেশ আছে। পরন্তু আমরা দেখি যে, তাঁহার শিক্ষার লক্ষ্য কেবল ইহুদীগণ ছিল। তিনিও স্বয়ং নিজেকে অপর জাতির জন্য কোন উপদেশ দানের অধিকারী মনে করেন নাই। অতএব কেমন করিয়া তিনি দয়া প্রদর্শন সম্বন্ধে সাধারণভাবে শিক্ষা দিতে পারিতেন। ইহুদীগণের মধ্যে তাঁহার শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকা সম্বন্ধে তাঁহার যে উক্তি বর্ণিত হইল, উহার বিপরীত কোন কথা যদি ইঞ্জিলে কোথাও লেখা থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে উহা প্রক্ষিপ্ত। কারণ এরূপ বৈষম্য সম্ভব নহে।

সেইরূপ তৌরাতের সম্মুখে শুধু ইহুদীগণ ছিল। তৌরাতের শিক্ষার চরম বিকাশ ইহুদীদের প্রয়োজন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে ব্যবস্থা সার্বজনীন ন্যায়পরায়ণতা, দয়া ও সহানুভূতির বাণী নিয়া পৃথিবীতে সর্বমানবের জন্য আসিয়াছে, তাহা শুধু কোরআন শরীফ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ, "বল, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সকলের নিকটে রসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি।" (সূরা আল্ আ'রাফ: ১৫৯)

তারপর বলেন:

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, "আমরা সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য তোমাকে পাঠাইয়াছি।" (সূরা আল্ আম্বিয়া: ১০৮)

চতুর্থ প্রশ্ন:

মসীহ্ তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল! আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"[৯]

আরও বলিয়াছেন: "আমি (জগতের) জ্যোতিঃ"[১০] "আমি পথ, সত্য ও জীবন।"[১১] ইসলাম প্রবর্তক কি এই বাক্যগুলি বা ইহাদের অনুরূপ বাক্য তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ব্যবহার করিয়াছেন?

টীকা-৯: মথি, ১১:২৮]; **টীকা-১০:** [যোহন, ৮:১২; **টীকা-১১:** যোহন, ১৪:৬। -অনুবাদক

উত্তরঃ

কোরআন শরীফে স্পষ্ট বলা হইয়াছে:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, "তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা খোদাকে প্রেম কর, আইস আমার অনুবর্তিতা কর, তাহা হইলে খোদাও তোমাদিগকে প্রেম করিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ৩২) 'আমার অনুবর্তিতার দ্বারা মানুষ খোদার প্রিয় হইয়া পড়ে', এই যে প্রতিশ্রুতি, ইহা যীশুর পূর্বোক্ত সকল কথাগুলিকে নিস্প্রভ করিয়া দিয়াছে। কারণ খোদার প্রিয় হওয়া অপেক্ষা মানুষের বড় কোন মর্যাদা নাই। সুতরাং যাঁহার পথে চলিয়া মানুষ খোদার প্রিয়জনে পরিণত হয়, তাঁহার অপেক্ষা নিজেকে জ্যোতিঃ বলিয়া দাবী করার বড় অধিকার কাহার আছে? এই জন্য আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কোরআন শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম নূর রাখিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ

অর্থাৎ, "তোমাদের নিকট খোদার জ্যোতিঃ আসিয়াছে।" (সূরা আল্ মায়েদা: ১৬) আর এই যে উক্তি: "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল! আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।" ইহা সম্পূর্ণ ফাঁকা কথা! যদি বিশ্রামের অর্থ পার্থিব বিশ্রাম ও উচ্ছৃঙ্খলতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই উক্তি সত্য। কারণ কেহ মুসলমান হইলে তাহাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িতে হয়। প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রভাতের নামাযের জন্য উঠিতে হয় এবং শীত ঋতুতে পানি যতই ঠাণ্ডা হউক, তাহা দিয়া অযূ করিতে হয়। তারপর পাঁচবার মসজিদের দিকে জামাতে নামাযের জন্য দৌড়াইতে হয়। আবার প্রায় এক প্রহর রাত্রি বাকী থাকিতে মধুর ঘুম ছাড়িয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে হয়। পরস্ত্রী দেখা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। মদ ও সকল প্রকারের নেশা হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে হইবে। খোদা কর্তৃক ধৃত হওয়ার ভয় করিয়া বান্দাদের হক্ আদায়ে যত্নবান থাকিতে হয়। প্রতি বৎসর একাদিক্রমে খোদার হুকুমে ৩০ বা ২৯ দিন রোযা রাখিতে হয় এবং যাবতীয় আর্থিক দৈহিক ও আত্মিক ইবাদত করিতে হয়। পক্ষান্তরে কোন দুর্ভাগা, যে ইতিপূর্বে মুসলমান ছিল, খ্রীষ্টান হইলে এই সব বোঝা নিজের মাথা

হইতে নামাইয়া ফেলে এবং নিদ্রা, আহার, মদ্যপান ও নিজেকে বিশ্রাম দেওয়া তাহার কাজ হয়। হঠাৎ সকল কঠিন ধর্ম-কর্ম ক্ষান্ত দিয়া পশুর ন্যায় পানাহার ও নাপাক বিলাসিতা ছাড়া তাহার আর কোনই কাজ থাকে না। সুতরাং, যদি যীশুর উপরোক্ত বিশ্রাম দেওয়া কথার ইহাই অর্থ হইয়া থাকে, তবে আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, প্রকৃতই খ্রীষ্টানগণ এই কয় দিনের পার্থিব জীবনে একান্ত বাঁধন-হারা বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। এমন কি, পৃথিবীতে উহার নজির নাই। তাহারা মাছির ন্যায় সকল জিনিসের উপরই বসিতে পারে এবং শূকরের ন্যায় সকল জিনিসই খাইতে পারে। হিন্দুরা গোমাংশ ভক্ষণ করে না। মুসলমান শূকর হইতে দূরে থাকে। কিন্তু তাহারা এই দুই-ই অবাধে হজম করে। 'খ্রীষ্টান হও, যাহা চাও কর'। সত্য কথা এই যে, শূকরকে নিষিদ্ধ নির্ধারণে তৌরাতে কত কড়া তাগিদ ছিল। এমন কি, উহাকে স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ছিল। পরিষ্কার লিখিত ছিল যে, ইহা চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এই শূকরকেও ছাড়ে নাই, যাহা সকল নবীর দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ছিল। যীশুর শরাবী-কাবাবী হওয়া যদি আমরা ধরিয়াও লই, কিন্তু তিনি কি কখনও শূকরের মাংস খাইয়াছিলেন? তিনি এক দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন, "তোমাদের মুক্তা শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও না।"[১২] সুতরাং, যদি মুক্তা পবিত্র বাক্যকে বুঝায়, তবে 'শূকরদিগের' শব্দ অপবিত্র ব্যক্তিকে বুঝায়। এই দৃষ্টান্তে যীশু পরিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছেন যে, শূকর অপবিত্র, কারণ উপমান ও উপমেয়, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার শর্ত থাকে।

বস্তুতঃ খ্রীষ্টানগণ যে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছারিতামূলক বিশ্রাম। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিশ্রাম, যাহা খোদার মিলনে লাভ করা যায়, উহার সম্বন্ধে আমি খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই খ্রীষ্টান জাতি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তাহাদের চোখের ওপর পর্দা ও তাহাদের হৃদয় মৃত এবং তাহারা আঁধারে নিপতিত। তাহারা প্রকৃত খোদা সম্বন্ধে একেবারে গাফিল এবং একজন দুর্বল মানুষ, অনাদি সত্তার সম্মুখে যিনি কিছুই নহেন, তাঁহাকে তাহারা অযথা খোদা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মধ্যে আশীষ নাই। তাহাদের মধ্যে চিত্তজ্যোতিঃ নাই। প্রকৃত খোদার প্রেম তাহাদের নাই। বরং সেই খোদার প্রকৃত পরিচয়ই তাহাদের নাই। তাহাদের মধ্যে কেহই নাই, এমন কি একজনও নাই, যাহার মধ্যে ঈমানের লক্ষণ পাওয়া

টীকা-১২: [(মথি, ৭:৬ পদ।]-অনুবাদক

যায়। যদি ঈমান সত্যই কোন নেয়ামত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার লক্ষণও থাকিতে হইবে। কিন্তু কোথায় আছে এমন খ্রীষ্টান, যাহার মধ্যে যীশুর বর্ণিত লক্ষণরাজি পাওয়া যায়? অতএব, হয় ইঞ্জিল মিথ্যা, নচেৎ খ্রীষ্টানগণ মিথ্যাবাদী।

দেখুন, কোরআন শরীফে ঈমানদারগণের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে সেরূপ লক্ষণযুক্ত মানুষ ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রতি যুগেই পাওয়া গিয়াছে। কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈমানদার এলহাম পাইয়া থাকে। ঈমানদার খোদার শব্দ শোনে। ঈমানদারের দোয়া সর্বাপেক্ষা অধিক কবুল হয়। ঈমানদারের নিকট গায়েবের (ভবিষ্যতের) খবর প্রকাশ করা হয়। ঈমানদারের সহিত স্বর্গীয় সাহায্য থাকে। পূর্ববর্তী যুগসমূহে যেমন এই সকল লক্ষণ পাওয়া যাইত, এখনও তেমনই যথারীতি পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোরআন শরীফ খোদার পবিত্র কালাম এবং কোরআনের ওয়াদা খোদার ওয়াদা। **হে খ্রীষ্টানগণ! আইস! যদি তোমাদিগের শক্তি থাকে তবে আমার মোকাবেলা কর।** আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিলে আমাকে নিশ্চয় যবাই করিয়া দাও। নচেৎ তোমরা খোদার অভিযোগের নিচে রহিয়াছ এবং জাহান্নামের আগুনের উপর তোমাদের পা রহিয়াছে।

وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى

[যে সৎপথে চলে তাহার প্রতি শান্তি হউক।]

লিখক,
খাকসার- মির্যা গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, জিলা: গুরুদাসপুর
২২ জুন, ১৮৯৭ সন

– সমাপ্ত–

Four Questions
by Mr. Sirajuddin, a Christian
And their Answers

(English rendering of the Urdu book *Sirajuddin 'Isa'i kei char swalon ka jawab*)

The Christian concept of Redemption through 'Accursed Sacrifice' is an abomination and a blasphemy against a beloved Prophet of God.

- Jesus of Nazareth did not die on the cross and did not become accursed.
- The Holy Quran has perfected the concept of Tauhid, or the Unity of God, although it was also taught by past scriptures.
- The teachings of the Holy Quran are meant for all people and all times. Earlier scriptures confined their teachings to specific people or nations.
- Islam enjoins 'love' only for God, while in relation to mankind it teaches 'mercy' and 'compassion'.
- Wars waged during the time of the Holy Prophet(sa) were to repel aggression and not to force Islam upon others.

These are some of the points elucidated by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian(as), (the Promised Messiah and Mahdi, founder of the Ahmadiyya Muslim Community), while responding to four questions sent to him by Mr. Sirajuddin, a Muslim who had turned to Christianity.

© *Islam International Publications Ltd., UK*

ISBN 978-984-991-053-4

978 984 991 053 4